"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালবেসে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক

গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই : দিল্লী

নিবেদন ঃ

আমার পরিণত জীবনে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চা সূত্রে পাশ্চাত্য ভারত-বিদ্যা পথিকদের মনীষা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন আমি ইঁহাদের জীবনবৃত্ত সংগ্রহ ও রচনায় ব্রতী থাকিয়া এইগুলি ধারাবাহিকভাবে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত "সমকালীন" পত্রে প্রকাশ করি। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ পঁচিশটি নিবন্ধ ১৩৭টি সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ "বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে গ্রন্থটি পাঠকসমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত হয় নাই। এতদ্বারা উৎসাহিত হইয়া আমি অতঃপর ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর একশত জন স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধকের জীবনী রচনার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া ইতিমধ্যে প্রায় অর্ধ শত জীবনী উপরোক্ত "সমকালীন" পত্রে প্রকাশ করিয়াছি। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে পঞ্চদশ জন প্রমুখ পণ্ডিতের জীবনীসহ আমার পরিকল্পিত শত-জীবনীর প্রথম খণ্ড সসঙ্কোচে সুধী পাঠক-পাঠিকাদের করকমলে নিবেদন করিতেছি। বাকী জীবনীগুলি এইরূপ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের বাসনা মনে মনে পোষণ করি। গ্রন্থরূপে প্রকাশকালে বর্তমান গ্রন্থের নিবন্ধগুলি আবশ্যক মত পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত বা সংশোধিত করা হইয়াছে।

ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভূতপূর্ব উপাচার্য, রবীন্দ্র-ভারতী), সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, এম. পি., কথাশিল্পী শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (উপাচার্য, বিশ্বভারতী), ডঃ কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষী ও সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। স্থানাভাবে সকলের নাম প্রকাশ করা সম্ভব নহে, আমি ইঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যেই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থের নির্ঘণ্টটি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। আমার তরুণ পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ অমিতাভ ও বিনায়কের দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে। আমি তাহাদের জন্য দেবী সারদার আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। প্রধানতঃ কলিকাতার জাতীয় পাঠাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি [illegible] গ্রন্থাগার হইতে আমার রচনার

উপকরণগুলি সুদীর্ঘ কালের পরিশ্রমে আহরিত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় গৌরব উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা ব্যতীত আমার সাহিত্য সাধনা ফলবতী হইতে পারিত না। পরমেশ্বরের নিকট আমি এই প্রতিষ্ঠানগুলি এবং উহাদের পরিচালক ও কর্মীবৃন্দের মঙ্গল ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করিতেছি।

বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশভার গ্রহণ করায় 'রূপা' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীযুক্ত দাউদয়াল মেহ্‌রা মহাশয়ের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থখানির সুষ্ঠু মুদ্রণ ও প্রকাশনে আমার স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন মাইতি ও সুহৃদ্‌বর সুসাহিত্যিক পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও উৎসাহ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

আমার বিশ্বাস ভারততত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছাত্র ও গবেষকরা এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন। তবে আমি এই গ্রন্থ শুধু তাঁহাদের জন্যই রচনা করি নাই। দৈবক্রমে উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত অথচ জ্ঞান-পিপাসু সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ভারত-বিদ্যার বিপুল বৈভব এবং ভারত-বিদ্যাসাধক পণ্ডিতদের জ্ঞাননিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও দেশপ্রেমের প্রতি আমাদের দেশের জনসাধারণ বিশেষতঃ তরুণ-তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণই আমার এই গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সফল হইলেও আমি কৃত-কৃতার্থ বোধ করিব। নিবেদনমিতি,

বিনীত
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

নিরভিমান জ্ঞান-তপস্বী

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু—

সূচীপত্র ঃ

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

(খ্রীঃ ১৮১২—১৮৮৫)

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তারানাথ ভট্টাচার্য বর্ধমান জেলার অম্বিকাকালনা গ্রামে এক সংস্কৃতজ্ঞ বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তারানাথের পিতার নাম ছিল কালিদাস সার্বভৌম। শৈশবেই তারানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। ৫ বৎসর বয়সের সময় কালনার পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট তারানাথের বিদ্যারম্ভ হয়। পাঠশালার শিক্ষণীয় সমুদয় বিষয় ৮ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই তারানাথ আয়ত্ত করেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি পিতা কালিদাস সার্বভৌম ও জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অমরকোষ প্রভৃতি পাঠ করেন। বাল্যকাল হইতেই তারানাথ অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় দান করেন। তদানীন্তন কালের বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু রামকমল সেনের (১৭৮৩-১৮৪৪) সহিত কালনার এই ভট্টাচার্য পরিবারের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। একবার কার্যোপলক্ষে রামকমল কালনার ভট্টাচার্য বাড়ীতে উপস্থিত হন। এই বাড়ীতে আসিয়া তিনি তরুণ তারানাথকে তাঁহার অপর এক আত্মীয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায় তর্করত দেখিতে পান। অল্পবয়স্ক তারানাথের সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত রামকমল জানিতে পারেন যে, সে তাঁহারই বন্ধু কালিদাসের পুত্র। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে এই বালক যে কালে একজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হইবে ইহা বুঝিতে পারিয়া রামকমল কালিদাসকে অনুরোধ করেন যেন তারানাথকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন কলিকাতার একজন মান্যগণ্য নাগরিক ছিলেন, তদুপরি তিনি

ছিলেন ভট্টাচার্য পরিবারের বিশেষ হিতৈষী। রামকমলের অনুরোধে কালিদাস সার্বভৌম তারানাথকে তাঁহার সহিত সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থে কলিকাতা পাঠাইতে সম্মত হন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তারানাথ সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ইহার মাত্র ছয় বৎসর পূর্বে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

'অলঙ্কার' শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় তারানাথ কলেজে কাব্য, বেদান্ত এবং জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে কাব্য, জ্যোতিষ ও অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন যথাক্রমে নাথুরাম শাস্ত্রী, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও যোগধ্যান মিশ্র। তারানাথের অধ্যয়নানুরাগ ও মেধাশক্তি দেখিয়া অধ্যাপকেরা তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ ন্যায় শ্রেণীতে উন্নীত হন, এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি। চারি বৎসর কাল ন্যায় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া তারানাথ শুধু ন্যায় নহে সমগ্র ষড়্‌দর্শনই বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। তারানাথ যখন ন্যায় শ্রেণীর ছাত্র তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) মহাশয় নিম্নতর অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে তারানাথের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ তারানাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও নিজ বিদ্যায়তনের এই কৃতী ছাত্রকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। পাঠে সাহায্য লাভের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই তারানাথের বাসস্থানে যাইতেন। ছাত্রাবস্থাতেই তারানাথ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ সংস্কৃত কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করিলে সরকারী শিক্ষা পরিষদ্ (এডুকেশন কাউন্সিল) তারানাথকে "তর্কবাচস্পতি" উপাধি দান করেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ 'ল কমিটি'র দ্বারা আয়োজিত মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজে ও স্বাধীনভাবে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু আইনে তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৮

খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বর্ধমানের সদর আমিন (মুন্সেফ) নিযুক্ত করেন। তারানাথ এই সরকারী পদ গ্রহণ না করিয়া অধ্যয়নার্থ কাশী গমন করেন এবং কয়েক বৎসর বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, গণিত, ফলিত জ্যোতিষ ও পাণিনি অধ্যয়ন করিয়া অশেষ শাস্ত্রবিৎ বলিয়া পরিগণিত হন। অতঃপর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া তারানাথ একটি চতুষ্পাঠী খোলেন। বাঙ্গলাদেশে ধনী ব্যক্তিদের দানে সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেন। স্বাধীনচিত্ত তারানাথ কাহারও অনুগ্রহদত্ত দানে চতুষ্পাঠী পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, নিজের ও অসংখ্য ছাত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহার্থে তিনি ব্যবসার আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি স্বগ্রামেই সহস্রাধিক তন্তুবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া স্থানে স্থানে বিক্রয়ার্থ পাঠাইতেন। এই সব বস্ত্র গোযান দ্বারা কাশী, মির্জাপুর, মথুরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানসমূহে প্রেরিত ও বিক্রীত হইত। ইহার পর তিনি নেপাল হইতে কাষ্ঠ আনাইয়া উহা বাঙ্গলা দেশে বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ঢেঁকিতে চাউল ছাঁটাইয়া উহা বিক্রয়ের ব্যবসাতেও তিনি হাত দেন। এইভাবে ব্যবসায়ে তারানাথ যে আয় করিতেন তাহা হইতেই তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের ও নিজের ভরণপোষণ হইয়া যাইত। ব্যবসায় পরিচালনের জন্য অক্লান্তকর্মী তারানাথের নিজের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কোন বিঘ্ন হইত না। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণের মৃত্যু হইলে সরকারী শিক্ষা পরিষদ্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ জি. টি. মার্শালকে এই শূন্যপদের জন্য একজন উপযুক্ত পণ্ডিত নির্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শালের অধীনে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মার্শাল ৯০৲ টাকা বেতনে এই

পদটি বিদ্যাসাগরকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নির্লোভ ও উদারহৃদয় বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য তারানাথের নাম প্রস্তাব করেন এবং স্বয়ং পদব্রজে অম্বিকাকালনায় গমন করিয়া তারানাথকে এই পদ গ্রহণে সম্মত করান। তারানাথের চাকুরি করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অনুজতুল্য বিদ্যাসাগরের এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি চাকুরি গ্রহণে সম্মত হন। বিদ্যাসাগর প্রমুখাৎ তারানাথের চাকুরি গ্রহণের সম্মতি পাইয়া মার্শাল সরকারী শিক্ষা পরিষদের নিকট তারানাথের নাম প্রস্তাব করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে লেখেন—"In every department he is in my opinion, far above mediocrity and in several branches of science, I doubt if any Pandit of Bengal can compete with him, namely in the Upanishad of Vedas, in Vedanta, Sankhya, Memangsa, Jyotisha and Patanjala." (দ্রঃ সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খণ্ড সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬১)।

শিক্ষা পরিষদ্ মার্শালের পরামর্শে মাসিক ৯০৲ বেতনে তারানাথকে ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তিনি কর্মে যোগদান করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের দর্শন ও ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপক থাকা কালে ৬২ বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার বেতন ছিল ১৫০৲ টাকা। অবসর গ্রহণের পর তিনি আজীবন ৭০৲ পেন্সন ভোগ করেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। সেক্রেটারি রসময় দত্তের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন পদত্যাগ করেন তখন তিনি কর্মভার তারানাথের হস্তে অর্পণ করেন। নূতন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত

তারানাথ ব্যাকরণ অধ্যাপকের দায়িত্ব সহ প্রায় ছয়মাস কাল এই পদেরও দায়িত্ব বহন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তারানাথ অতিশয় নিষ্ঠাবান ছিলেন। প্রত্যহ উপাসনাদির পর তিনি স্বপাক নিরামিষ আহার করিতেন। সামাজিক ব্যাপারে তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে তারানাথ নিজ কন্যা জ্ঞানদাকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। সমাজের ভয়ে যে সমস্ত অভিভাবক কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইতেন না—তাঁহাদিগকে তিনি বুঝাইয়া দিতেন যে, বালিকাদের শিক্ষাদান শাস্ত্রসম্মত। তারানাথের ন্যায় একজন অতি নিষ্ঠাবান মহাপণ্ডিতের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া কলিকাতা সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও অতঃপর কন্যাদের শিক্ষাদানে অগ্রসর হন। বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনে তারানাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রভূত সহায়তা দান করেন। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ তারানাথই ঈশ্বরচন্দ্রকে সংগ্রহ করিয়া দেন। তারানাথের পরামর্শে বহু পণ্ডিতও বিধবা বিবাহ বিধির স্বপক্ষে আসেন। বিধবা বিবাহ আইন পাস করাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন প্রেরিত হয় পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাহার অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এইজন্য বিদ্যাসাগরের ন্যায় তারানাথকেও অশেষ সামাজিক নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গলা ১২৬৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ বিদ্যাসাগর-সুহৃৎ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা সুকিয়া স্ট্রীটস্থ গৃহে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বালবিধবা কালীমতির পাণিগ্রহণ করেন। এই যুগান্তকারী প্রথম বিধবা-বিবাহ সভায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র যখন একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করেন তখন বিদ্যাসাগর পরিবারের কোন আত্মীয়া লোকাচারসম্মত বধূবরণে সম্মত হন নাই ; তারানাথ তর্কবাচস্পতির

সহধর্মিণীই এই বধূবরণ কার্য সম্পন্ন করেন। তারানাথ বাল্য-বিবাহেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেন নাই। বিদ্যাসাগরের ন্যায় তারানাথও বহুবিবাহ-বিরোধী ছিলেন। তারানাথ দুইবার বিপত্নীক হইয়া তৃতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন কিন্তু কোন পত্নীর জীবিতাবস্থায় অন্য পত্নী গ্রহণ করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়া একটি পুস্তক রচনা করিলে তারানাথও 'বহুবিবাহবাদ' নামে একটি পুস্তক রচনা করিয়া প্রমাণ করেন যে, বহুবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। পরম সুহৃৎ বিদ্যাসাগরের সহিত তারানাথের এই প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগরের অনুজ পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তারানাথকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তারানাথ তাঁহাকে বলেন যে, "বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও এই প্রথা হইতে জগতের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে এবং আমাদের সমাজের এতদূর বল নাই যে, সমাজ হইতে এই কুপ্রথা নিবারণ হইতে পারে; এই কারণে রাজদ্বারে আবেদন সময়ে ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করি। কিন্তু তা বলিয়া ইহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা আমি বলিতে পারি না।" (বিদ্যাসাগর জীবন চরিত, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃঃ ২০৬-৭. বুকল্যাণ্ড সংস্করণ)।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ ভাস্করাচার্য রচিত 'লীলাবতী' নামক বীজগণিত পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভট্টোজী দীক্ষিতের শব্দকৌস্তুভের সারাবলম্বনে কৌণ্ড ভট্ট রচিত 'বৈয়াকরণ ভূষণ সূত্রসারঃ' সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য তারানাথ বাঙ্গলায় 'বাক্যমঞ্জরী' নামে একটি ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন। এই বৎসরই তিনি বিভিন্ন ব্যাকরণ পুস্তকের সার সংগ্রহ করিয়া 'শব্দার্থ-রত্ন' নামে সরল সংস্কৃত ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। তারানাথ সম্পাদিত ও রচিত এই পুস্তকগুলি বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিল।

কালনা ত্যাগ করিয়া আসিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কালে তারানাথ পুস্তক রচনা ও স্বগৃহে ছাত্রদিগকে বিদ্যাদানে ব্রতী থাকিলেও ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই। কালনায় বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কারের দোকান, সিউড়িতে বস্ত্রের দোকান, বীরভূমে ১০,০০০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ, ৫০০ গরু রাখিয়া উৎপন্ন ঘৃত কলিকাতায় বিক্রয় প্রভৃতি কাজে তাঁহার বহু অর্থ নিয়োজিত থাকিত। অর্থোপার্জনের নানা উপায় সম্বন্ধে তারানাথের বুদ্ধি প্রখর ছিল কিন্তু তিনি মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞ ছিলেন না, অসাধু কর্মচারীদের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করার ফলে তাঁহার ব্যবসায়ে প্রচুর ক্ষতি হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লক্ষাধিক টাকার ঋণজালে জড়াইয়া পড়েন। এই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল (১৮২৬-১৯০৩)। কাউয়েল তারানাথের একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। ইনি উদয়নাচার্য রচিত 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (সংস্কৃত কলেজের অপর একজন অধ্যাপক) ও তারানাথ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন : "The two most learned Hindus I have met during my residence in India"। কাউয়েল তারানাথকে সংস্কৃতের জীবন্ত বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) জ্ঞান করিতেন। লোকের নিকট তিনি বলিতেন যে, সংস্কৃতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহা তারানাথের কণ্ঠস্থ নহে।

ছাত্র ও জনসাধারণের সুবিধার্থে দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি মুদ্রিত করাইবার জন্য এই সময় কাউয়েল তারানাথকে পরামর্শ দান করেন। ইতিপূর্বে তারানাথ মাঘ রচিত 'শিশুপাল বধ', ভারবি রচিত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' (১৮৪৭), ভবভূতি রচিত 'মহাবীর চরিতম্' (১৮৪৭) ও কাঞ্চনাচার্য রচিত 'ধনঞ্জয় বিজয়ম্' (১৮৫৭) স্বকৃত টীকাসহ প্রকাশ করিয়া অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। পরম হিতৈষী সুহৃৎ ও উপরিতন কর্মচারী কাউয়েলের পরামর্শ

শিরোধার্য করিয়া তারানাথ অতঃপর সংস্কৃত পুস্তক স্বকৃত টীকাসহ সম্পাদন ও সুষ্ঠু মুদ্রণের কার্যে ব্রতী হন। আমৃত্যু এই কার্যে রত থাকিয়া তিনি প্রচুর বিত্ত অর্জন করেন এবং উত্তমর্ণদের প্রাপ্য সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া যান। সুষ্ঠু সম্পাদন ও নির্ভুল মুদ্রণের জন্য তারানাথ প্রকাশিত পুস্তকগুলি ভারতে ও বিদেশে বিশেষভাবে আদৃত হয়। তারানাথ যে সমস্ত পুস্তক স্বকৃত টীকাসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : বাণভট্ট—কাদম্বরী (১৮৭১), দণ্ডী—দশকুমার চরিতম্, হিতোপদেশঃ (১৮৭৬), ঈশ্বরকৃষ্ণ—সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী (১৮৭১), জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ—ভামিনী বিলাস (১৮৭২), ভট্টনারায়ণ—বেণী সংহার (১৮৬৮), কালিদাস—মালবিকাগ্নি মিত্রম্ (১৮৭০), কুমারসম্ভবম্ (১৮৮৬), কেদারভট্ট—বৃত্তরত্নাকর ছন্দোমঞ্জরী (১৮৮৭), বিশাখ দত্ত—মুদ্রারাক্ষসম্ (১৮৭০), বোপদেব—কবি কল্পদ্রুম (১৮৭২), সর্বদর্শন সংগ্রহঃ (১৮৭২) ইত্যাদি। মধুসূদন সরস্বতী রচিত সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থটি তারানাথ সরল সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। উহা 'সিদ্ধান্ত বিন্দুসার' নামে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কাউয়েলের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে সরকারী শিক্ষা বিভাগ ভট্টোজী দীক্ষিত রচিত 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' ব্যাকরণ প্রকাশের জন্য সম্পাদককে ২,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হন, গভর্ণমেণ্ট হইতে দুইশত পুস্তক ক্রয়েরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কাউয়েল গভর্ণমেণ্টকে জানান যে, তারানাথই এই কার্যের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ("I question if any one is equal to him in Bengal."—দ্রঃ সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬১)। শিক্ষাবিভাগ কাউয়েলের পরামর্শ গ্রহণ করায় তারানাথের উপর এই কর্ম ন্যস্ত হয়। পাণিনীয় সূত্রগুলি ভট্টোজীর 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী'তে সুবিন্যস্তভাবে লিখিত হইলেও তারানাথ উহাকে আরও সুগম করিবার নিমিত্ত সরল সংস্কৃত ভাষায় ইহার একটি

টীকা রচনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' তারানাথ রচিত 'সরলা' টীকাসহ ১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাউয়েল এই গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। দেশে ও বিদেশে এই গ্রন্থটি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। জার্মান দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই পুস্তকটি পাঠ্য নির্বাচিত হয়। এই সম্বন্ধে কাউয়েল গভর্ণমেণ্টকে লেখেন: "The book is well done and it is a great boon to Sanskrit Learning that we have now a standard edition of such a valuable work." (দ্রঃ সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬১)। ১৮৭০-৭১ ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ সম্পাদিত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ২য় ও ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ পাণিনীয় ব্যাকরণের সারাবলম্বনে 'আশুবোধ ব্যাকরণম্' নামে সরল সংস্কৃত ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ রচনা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্ট্যুকর (১৮২১-১৮৭২) এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অকারাদি ক্রমে ধাতুরূপ সাধনের জন্য তারানাথ 'ধাতুরূপাদর্শ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন।

১৮৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ 'শব্দস্তোম মহানিধি' নামে পাঁচ খণ্ডে একটি সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিধানটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকটির চতুর্থ সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তারানাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার রচিত বাচস্পত্য অভিধান (বাচস্পত্যম্)। ১৮৭৩ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সার্ধ পঞ্চসহস্র পৃষ্ঠার (ডিমাই কোয়ার্টার) ছয় খণ্ড এই অভিধান তারানাথের একক প্রচেষ্টায় সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হয়। এই অভিধান মুদ্রণে প্রায় ৮০,০০০ টাকা

ব্যয় হয়। তারানাথ এই ব্যয়ভার একাই বহন করেন। এই অভিধানে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত সকল শব্দ প্রয়োগ-বিধিসহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন শব্দার্থ প্রামাণ্য উদ্ধৃতিসহ ২৫-৩০ পৃষ্ঠায় এই অভিধানে সন্নিবিষ্ট হয়। বাচস্পত্যের ন্যায় এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃত অভিধান ইহার পূর্বে বা পরে আর রচিত হয় নাই। সম্প্রতি কাশীধামস্থ চৌখাম্বা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (১৯৬২)। সংস্কৃতচর্চার ইতিহাসে তারানাথের একক চেষ্টায় বাচস্পত্যাভিধান রচনা একটি অতি উল্লেখনীয় ঘটনা। বাচস্পত্যাভিধানের উপযোগিতা বর্তমানেও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেশে ও বিদেশে অদ্যাপি ইহা বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

স্মৃতিশাস্ত্রেও তারানাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা ভাষায় তিনি গয়ামাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধ পদ্ধতি নামে দুইখানি পুস্তক লিখিয়া উহার ৩,০০০ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করেন। পরে তিনি সংস্কৃতে গয়াশ্রাদ্ধ পদ্ধতিঃ (১৮৭২), তুলাদানাদি পদ্ধতি (১৮৬৬) ও গায়ত্রীভাষ্যম্ (১৮৭৫) নামে নিত্যপ্রয়োজনীয় তিনটি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর পুস্তক প্রকাশের কাজে তারানাথ প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থে বাটি ক্রয় করিয়া তিনি একটি অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে আহার ও আশ্রয় দিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যূল্যর্ (১৮৩৭-১৮৯৮) তাঁহার 'ফ্রী সংস্কৃত কলেজ' পরিদর্শন করিয়া এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ উচ্চশিক্ষাদান পদ্ধতি তিনি কোথাও দেখেন নাই। তারানাথ পরের উপকার করিতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। দরিদ্রকে অন্নদান ও আত্মীয়স্বজনকে স্বয়ং রন্ধন দ্বারা ভূরিভোজনে তৃপ্ত করা তাঁহার অন্যতম ব্যসন ছিল।

মাতৃভাষায় তারানাথের সবিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রথম জীবনে তিনি কবির দল ও হাফ্ আখড়াই-এর জন্য বাঙ্গলা গান বাঁধিয়া দিতেন। একসময়ে তিনি একটি বাঙ্গলা পঞ্জিকা প্রকাশ করেন; ইহার ভূমিকায় তিনি ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতদের গ্রহগণের আকার ও গতিবিধি সম্পর্কিত মতগুলি বাঙ্গলায় পয়ার ছন্দে প্রকাশ করেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে 'লাঠি থাক্‌লে পড়ে না' নামে বাঙ্গলা ভাষায় তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১—১৮৭০) মহাশয় তদীয় মহাভারত অনুবাদ কার্যে—বিশেষতঃ দুরূহ কূটার্থসমূহের মর্মগ্রহণে তারানাথের পরামর্শ লইতেন। কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের উপসংহারে স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, "কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এরূপ না করিলে মহাভারতের দুরবগাহ কূটার্থের কখনই প্রকৃষ্টানুবাদে সমর্থ হইতাম না।"

তারানাথের প্রথমা পত্নী বিবাহের ছয় মাস পরেই পরলোক গমন করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। প্রথম ও তৃতীয় পুত্র দীর্ঘজীবী হন নাই। দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যুর পর তারানাথ তৃতীয়বার বিবাহ করেন, ইঁহার দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র জীবানন্দ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জীবানন্দ সংস্কৃত কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন ও বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। তারানাথ দেশে ও বিদেশের সমগ্র বিদ্বৎ-মণ্ডলীর পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। বহু দেশীয় রাজন্যগণ তারানাথকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। মহাপণ্ডিত পিতার যোগ্যপুত্র জীবানন্দকে কাশ্মীর ও নেপালের মহারাজা অতি উচ্চ বেতনে কোন উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন। জীবানন্দ এই প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া পিতার পদাঙ্কানুসরণে সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং

১০৭ খানি সংস্কৃত পুস্তক স্বীয় টীকাসহ ও ১০৮ খানি পুস্তক বিনা টীকায় সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। সংস্কৃত পুস্তক প্রচার দ্বারা জীবানন্দ বিদ্যাসাগর অক্ষয়কীর্তি অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত সোমদেবের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থটি সংস্কৃত গদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পুত্র কৃতবিদ্য হইয়াছে দেখিয়া তারানাথ সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী গমন করেন। কাশী যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁহার ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত ঋণ এমনকি মফঃস্বলের কর্মচারীদের কৃত ঋণও কড়াক্রান্তিতে শোধ করিয়া যান, বহু উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারীদিগকে তিনি বহু আয়াসে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন এবং তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের প্রাপ্য অর্থ তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করেন। বহু ঋণ তামাদি হইয়া গিয়াছিল, উত্তরাধিকারীরাও এই পাওনার বিষয় জানিত না। আইনের ফাঁকির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তারানাথ লোকসমাজে সততার এক অভিনব দৃষ্টান্ত রাখিয়া কাশীযাত্রা করেন।

১২৯২ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় (১৮৮৫ খ্রীঃ) কাশীধামে একমাত্র জীবিত পুত্র জীবানন্দের উপস্থিতিতে তারানাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মণিকর্ণিকা ঘাটে তাঁহার নশ্বরদেহ ভস্মীভূত করা হয়।

তারানাথের মৃত্যু সংবাদে সমগ্র দেশ শোকগ্রস্ত হয়। এই সংবাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি অশ্রুপাত করিতে থাকেন ও বলেন, "ভারত পণ্ডিতশূন্য হইল।" (দ্রঃ—তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবন চরিত—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন)।

তারানাথের সমসাময়িক কালের একজন প্রসিদ্ধ মনীষী আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তারানাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ "তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ" (পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত, প্রথম সং, পৃঃ ২০৩)।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ্রীঃ ১৮১৩-১৮৮৫)

উত্তর কলিকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে (১২২০ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ) এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত নবগ্রাম। সঙ্গতিহীন জীবনকৃষ্ণ বিবাহের পর কলিকাতায় শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন, এইস্থানেই কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। কৃষ্ণমোহন পিতার মধ্যমপুত্র। একে একে জীবনকৃষ্ণের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মিলে তাঁহাকে শ্বশুরালয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি উত্তর কলিকাতার গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। জীবনকৃষ্ণ বিশেষ লেখাপড়া জানিতেন না, এই জন্য তিনি প্রয়োজনানুযায়ী অর্থোপার্জনও করিতে পারিতেন না, তাঁহার সাধ্বী পত্নী চরকায় সুতা কাটিয়া বা দড়ি পাকাইয়া সংসারের অভাব মিটাইতে চেষ্টা করিতেন। এই পরিবেশেই ডেভিড্ হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) প্রবর্তিত স্কুল সোসাইটির দ্বারা পরিচালিত আরপুলি পল্লীতে অবস্থিত একটি পাঠশালায় অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে কৃষ্ণমোহনের বিদ্যারম্ভ হয়। হেয়ার মহোদয় বালক কৃষ্ণমোহনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে গ্রহণ করিয়া তাঁহার উচ্চ শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া কৃষ্ণমোহন স্কুল সোসাইটির বৃত্তি লাভ করিয়া ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন।

হিন্দু কলেজে পাঠকালেও কৃষ্ণমোহন সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এখানেও তিনি মাসিক ষোল টাকার বৃত্তি লাভ করেন।

স্কুল ও কলেজে পাঠকালে কৃষ্ণমোহন স্বেচ্ছায় গৃহে একবেলা সকলের জন্য রন্ধন করিতেন; রন্ধনশালার কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতা এই সময়টুকু সুতা কাটা বা অন্য কাজে ব্যয় করিতেন, ইহাতে সংসারের উপার্জন বাড়িত।

হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালে কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ডিরোজিও কৃষ্ণমোহনকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হিন্দু কলেজে কৃষ্ণমোহনের সতীর্থমণ্ডলীর মধ্যে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উত্তরকালীন কৃতী বঙ্গ-সন্তানের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার পর সহৃদয় ডেভিড হেয়ার মহোদয় কৃষ্ণমোহনকে নিজের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কর্ম প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁহার পিতা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে দারিদ্র্য-জর্জরিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি ডিরোজিওর নেতৃত্বে বিদ্যাচর্চার জন্য তাঁহার অনুগামী ছাত্রদের সহায়তায় 'একাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন্' নামীয় যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় কৃষ্ণমোহন ইহার একজন অগ্রগণ্য ও সক্রিয় সদস্য হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কৃষ্ণমোহন 'এনকোয়েরর' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রবর্তন করেন। এই পত্রে হিন্দু ধর্মের দোষত্রুটিগুলি আলোচিত হইত এবং শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা থাকিত। নব্য-শিক্ষার প্রভাবে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার সতীর্থ 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর আস্থা ছিল না। ইহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু সমাজকে নানাভাবে আক্রমণ ও উত্যক্ত করিত। একদিন কৃষ্ণমোহনের কতকগুলি বন্ধু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষাকালে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর

বাড়ীতে গোমাংস, অস্থি, প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া নিজেরাই ইহার প্রতি গৃহস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৃহস্বামীকে বিব্রত ও অপদস্থ করাই ছিল এই নব্য যুবাদের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণমোহনের বন্ধুদের এবংবিধ অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত পল্লীবাসিগণ কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট কৃষ্ণমোহনকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার দাবি জানায়। পল্লীস্থ ব্যক্তিদের চাপে পড়িয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন অগত্যা কৃষ্ণমোহনকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দেন। গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াই পল্লীস্থ ব্যক্তিদের ক্রোধ শান্ত হয় নাই, ইহাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য হেয়ার স্কুল হইতেও কৃষ্ণমোহনকে পদচ্যুত করা হয়।

গৃহ ও সমাজচ্যুত কৃষ্ণমোহন এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক আলেকজাণ্ডার ডাফের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগী হইয়া পড়েন। গৃহচ্যুত কৃষ্ণমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডাফ্ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনের পর কৃষ্ণমোহন 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' পরিচালিত মধ্য কলিকাতায় অবস্থিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্কডিকন ডিয়েলট্রি নামক পাদ্রীর সহায়তায় কৃষ্ণমোহন বিশপ্স কলেজে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-যাজক শ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন হেদুয়া পল্লীর নবনির্মিত গীর্জার পাদ্রীর পদ লাভ করেন। বেথুন কলেজের দক্ষিণে বর্তমান বিধান সরণির উপর অবস্থিত এই গীর্জাটি এখনও কৃষ্ণ বন্দ্যোর গীর্জা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাল্যকালেই কৃষ্ণমোহনের বিবাহ হয়। কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার পত্নী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পিতা বিন্ধ্যবাসিনীকে নিজ গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যান। বিন্ধ্যবাসিনীর ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলিত হইতে দেওয়া হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণমোহন তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা ও পত্নীর প্রতি পূর্বের মতই অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন।

ইহার শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই পুরাণ গ্রন্থটি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত[২]।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন হিন্দুর ষড়্‌দর্শন ও বেদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি সুবৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন[৩]। এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'ষড়্‌দর্শন সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়[৪]। বাঙ্গলা ভাষায় ষড়্‌দর্শনের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর কোন পণ্ডিতের লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্র' নামক সংস্কৃত মূলগ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত রূপে প্রকাশিত হয়[৫]।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যসহ বেদান্তীয় ব্রহ্ম সূত্রের একাংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন[৬]। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের কতকাংশ মূল, স্বকৃত টীকা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেন, ইহার সহিত বেদপাঠ সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছিল[৭]। এই বৎসরই 'আর্যশাস্ত্রের সাক্ষ্য' নামে

২ Markandeya Purana, Bibliotheca Indica, 1851—1862.

৩ Dialogues on the Hindu Philosophy comprising Naya, Sankhya and Vedanta to which is added a discussion on the authority of the Vedas, Calcutta, 1861.

৪ ষড়্‌ দর্শন সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৮৬৭।

৫ নারদ পঞ্চরাত্র, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1865.

৬ Vedanta Brahma Sutras with commentary of Sankarach-arya, Calcutta, 1870.

৭ Rigveda Samhita: The first and second Adhyas of the first Astaka with notes and explanation and an introductory essay on the study of the Vedas, Calcutta, 1875.

ইংরেজী ভাষায় তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি বৈদিক সাহিত্যের উদ্ধৃতি সহকারে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, বাইবেলে যে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই বীজাকারে বৈদিক সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট আছে[৮]।

ছাত্রদের সুবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণমোহন কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ এবং ভট্টি রচিত কাব্যের কতকাংশ স্বকৃত টীকা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৬৭—১৮৭৪)।

কৃষ্ণমোহন কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি ও লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে কৃষ্ণমোহন নারদপঞ্চরাত্র ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ—এই গ্রন্থ দুটি সম্পাদনা করেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সোসাইটির পত্রিকাদিতে তাঁহার যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে মহিম্ন স্তবের ইংরেজী অনুবাদ, পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ প্রণালী ও নরমেধ বিষয়ক প্রবন্ধের নাম উল্লেখযোগ্য[৯-১১]।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই কৃষ্ণমোহন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। বহুকাল ধরিয়া তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে উপাধি পরীক্ষার

---

৮ Arian Witness or the testimony of the Arian Scriptures in corroboration of Biblical history and rudiments of Christian doctrine including dissertation on the Original home and early adventure of Indo-Arians, Calcutta, 1875.

৯ Mahimna Stava or hymn to Siva with Eng Trans., (JA S. B. Vol 8, 1839).

১০ On translation of technical terms (Proceedings of Asiatic Soc. of Bengal), 1866

১১ On human sacrifices of India (Ibid, 1876).

পরীক্ষকের কার্য করেন। কোন কোন সময়ে তিনি ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষারও পরীক্ষকের কার্য করিতেন। পাঠসূচী, পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধেও তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হইত।

কিছুকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের 'ডীন' (ডীন্ অফ্ ফ্যাকাল্টি অফ্ আর্টস) পদেও বৃত ছিলেন। ১৮৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক (অনারারি) ডক্টর অফ্ ল (LL. D.) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার সঙ্গে আর যে দুইজন মনীষীকে অনুরূপভাবে সম্মানিত করা হয় তাঁহাদের নাম—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ইংরাজ-সংস্কৃতজ্ঞ স্যার মনিয়র উইলিয়মস্। এই বৎসরেরই প্রথম দিকে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট কৃষ্ণমোহনকে সি-আই-ই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনান্তকাল পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশে সামাজিক, শিক্ষামূলক অথবা রাজনৈতিক সকল আন্দোলনেই কৃষ্ণমোহন অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৩৪-৩৫ হইতেই তিনি শিক্ষাজগতে বাঙ্গলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের (১৮০১-১৮৫১) নাম চিরস্মরণীয়। এই বেথুন মহোদয়ের স্মৃতি রক্ষা কল্পে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'বেথুন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণমোহন তাহার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য জর্জ টমসন নামক ইংরাজ বাগ্মী কর্তৃক 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণমোহন ইহার একজন সক্রিয় সদস্য হন। এই সংস্থার উত্তরাধিকারী 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন্' ভারতবাসীর রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করিলেও শেষদিকে রাজা, মহারাজা ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থেই আত্ম নিয়োগ করে। জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য নাই

দেখিয়া কৃষ্ণমোহন এই সংস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সাংবাদিক ও জনসেবক শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ালীগ'-এ যোগদান করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এই সংস্থার সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশনায়ক আনন্দমোহন বসু ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক ও বাহক হিসাবে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন' স্থাপন করেন তখন কৃষ্ণমোহনও ইহার অন্যতম নেতা হন। কিছুকাল তিনি এই সংস্থারও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন (১৮৭৮)। এদেশে রাজনৈতিক জাগরণের উষাকালে চাকুরিতে ভারতীয় নিয়োগ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, প্রজাদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার প্রভৃতি বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করিয়া যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলিকাতায় রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জনসভাগুলিতে প্রায়শঃই কৃষ্ণমোহনকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখা যাইত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯২৫) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Nation in Making (1925) গ্রন্থে কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :—"He was associated with the India League and became president of Indian Association. He was then past sixty, and though growing years had deprived him of alertness of youth, yet in keenness of his interest and in vigour and outspokenness of his utterances, he exhibited the ardour of the youngest to our ranks. Never was there a man more uncompromising in what he believed to be true and hardly was there such amiability combined with such strength and fairness." (P 61)

কলিকাতার প্রভাবশালী হিন্দুসমাজ ধর্মে খ্রীষ্টান এবং পেশায় খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক কৃষ্ণমোহনকে যে কুণ্ঠার সহিত দূরে সরাইয়া রাখেন নাই তাহার মূলে ছিল তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, বিচার-বুদ্ধি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা ও অন্যায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা। প্রধানতঃ 'ইণ্ডিয়া লীগ'-এর অবিশ্রান্ত আন্দোলনের ফলে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন ব্যবস্থায় নব-বিধান প্রবর্তিত হয়। জনসাধারণের ভোটে কৃষ্ণমোহন নবগঠিত মিউনিসিপ্যালিটির 'কমিশনার' নির্বাচিত হন। কমিশনাররূপে করদাতাদের বিশেষতঃ ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষায় তিনি সর্বদাই তৎপর থাকিতেন।

বিশপ্‌স কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর হইতে কৃষ্ণমোহন কলিকাতাতেই বাস করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে (২৯শে বৈশাখ, ১২৯২) কৃষ্ণমোহন তাঁহার ৭নং চৌরঙ্গী লেনস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। এই দেশহিতৈষী ও পণ্ডিত পুরুষের পরলোক গমনে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। হাওড়া শিবপুরস্থ বিশপ্‌স কলেজ সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে কৃষ্ণমোহনের নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইলে এইখানেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহন মৃত্যুকালে দুইটি বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া যান। কলিকাতার স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রকুমার তাঁহার প্রথমা কন্যা কমলার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি পূর্বেই পরলোক গমন করেন। মিঃ স্টুয়ার্ট নামীয় একজন বিদেশীয় ভদ্রলোকের সহিত দ্বিতীয়া কন্যা দেবকীর বিবাহ হয়। কৃষ্ণমোহনের তৃতীয়া কন্যা মনোমোহিনী মিঃ হুইলার নামে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত উদ্‌বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মনোমোহিনীর পুত্র রেভাঃ ই. এম্. হুইলার দীর্ঘকাল যাবৎ বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, কিছুকাল তিনি কলিকাতা শহরেও অধ্যাপনা করেন।

ইংরেজী ভাষার নিপুণ অধ্যাপকরূপে কৃষ্ণমোহন-দৌহিত্র হুইলারের নাম তাঁহার জীবিত কৃতবিদ্য ছাত্রেরা এখনও স্মরণ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণমোহনের মৃত্যুতে সুপ্রসিদ্ধ 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

"On Monday the 11th May, there passed away from this earthly scene the spirit of one of the foremost men in Bengal, the last of a goodly band of indigenous youths, who five and fifty years ago unlocked in this country the treasures of Western Knowledge and made themselves intellectually rich···His intellect was of a high order not of the philosophical kind, but clear, luminous and practical. He was a man of great force of character and of strong individuality···As a citizen and municipal Commissioner he rendered good service to the city Corporation, and as President of the Indian Associated he endeavoured to do what he thought would promote the political and social amelioration of his country men." (18. 5. 1885).

ডাঃ ভাউ দাজী

(১৮২১—১৮৭৪)

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার নিকট মান্দ্রা গ্রামে এক দরিদ্র গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে ভাউ দাজী জন্মগ্রহণ করেন। ভাউ দাজীর পিতার সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, কৃষিলব্ধ আয় হইতে কায়ক্লেশে তিনি পরিবার প্রতিপালন করিতেন। তিনি উত্তম কবিতা রচনা করিতেও পারিতেন। স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি কিছু অর্থও উপার্জন করিতেন। বাল্যকালেই ভাউ দাজীর বিশেষ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতা ইহাতে বিশেষ হৃষ্ট বোধ করেন ও বিদ্যা শিক্ষা দানের নিমিত্ত ভাউ দাজীকে বোম্বাই শহরে লইয়া আসেন; এই সময়ে ভাউ দাজীর বয়স ছিল আট বৎসর। কিছুকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী বৃত্তি সহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে ১৮ মাস কাল অধ্যয়নের পর দারিদ্র্যের জন্য তিনি কলেজ ত্যাগ করেন ও বোম্বাই এর এলফিন্স্টোন স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শিশুহত্যার কুফল সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া ভাউ দাজী ৬০০৲ টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। এই সময়ে গুজরাটের কচ্ছ ও কাথিওয়াড় অঞ্চলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্যোজাত শিশু বিশেষতঃ কন্যাসন্তানকে হত্যা করা হইত। ভাউ দাজীর প্রবন্ধটি এই কুপ্রথা দূরীকরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই ভাউ দাজী সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শিক্ষকতা কালে তিনি বিশেষভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চা আরম্ভ করেন। অসাধারণ

প্রতিভাধর ভাউ দাজী স্বাধীন ভাবে অধ্যয়ন করিয়া এই দুই বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন কীর্তি সমন্বিত স্থানগুলি পরিদর্শন ও তাহাদের সম্বন্ধে গবেষণা ভাউ দাজীর অতিশয় প্রিয় কর্ম ছিল। এইরূপ একটি স্থানে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ই. পেরির সহিত পরিচয় লাভ করেন। ভাউ দাজীর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে শিক্ষকতা ত্যাগ করাইয়া বোম্বাই-এর সদ্য প্রতিষ্ঠিত গ্র্যান্ট মেডিকেল কলেজে ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করিতে প্ররোচিত করেন। মিঃ পেরির সহায়তায় ভাউ দাজী ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন ও পাঁচ বৎসর পর অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত এই কলেজের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বল্পকাল মেডিকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কার্য করিয়া ডাঃ ভাউ দাজী বোম্বাই শহরে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ভেষজ ও শল্য উভয়বিধ চিকিৎসাতেই ভাউ দাজী সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। অচিরকালের মধ্যেই তিনি বোম্বাই শহরে ও প্রদেশে চিকিৎসা জগতের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার কিছুদিন পর তিনি নিজ ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, এখানে তিনি বিনামূল্যে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার ভ্রাতাও একজন চিকিৎসক ছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনায় তিনিও অগ্রজের সহযোগিতা করিতেন। শিক্ষকতা কালে সংস্কৃত চর্চার সময় ভাউ দাজী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় পুঁথি পড়িতে পড়িতে তিনি কুষ্ঠরোগ প্রতিষেধক একটি ভেষজের সন্ধান পান। এই সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর তিনি কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক একটি ঔষধ আবিষ্কার করেন। কুষ্ঠরোগের প্রথম অবস্থায় ওই ঔষধ বিশেষ কার্যকরী হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসকদের একটি বোর্ড ডাঃ ভাউ

দাজীর আবিষ্কৃত ঔষধটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ঔষধটি সন্তোষজনক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অতঃপর বোম্বাই-এর জামসেদজী জিজাভাই দাতব্য চিকিৎসালয়ের কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার ভার ভাউ দাজীর উপর অর্পণ করা হয়। বোম্বাই-এর চিকিৎসক বোর্ড ভাউ দাজী কর্তৃক আবিষ্কৃত ভেষজের গুণাবলী সম্বন্ধে তদানীন্তন ভারত সচিবকে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। ভারত সচিব ডিউক অফ্ আরগাইল রিপোর্টটি পাইয়া ভাউ দাজীকে তাঁহার আবিষ্কারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভাউ দাজী এই ঔষধটি আরও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে আজীবন পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত ছিলেন, ঔষধটিকে সর্বক্ষেত্রে অমোঘ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে এই সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া ঔষধটির ব্যাপক ও অবাধ প্রচার তাঁহার অভীষ্ট ছিল। দীর্ঘকালীন রোগভোগ ও মৃত্যুর জন্য ভাউ দাজী এই ঔষধটি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া উহা সর্বসাধারণের অধিগম্য করিয়া যাইতে পারেন নাই। ডাঃ ভাউ দাজী বোম্বাই শহর ও প্রদেশে সকল রকম জনহিতকর কার্যে নিজ সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসভা স্থাপনের বহু পূর্বেই তিনি নাওরোজী ফার্দুনজীর সহযোগিতায় বোম্বাই এসোসিয়েশন নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, এই এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে জনগণের অভাব অভিযোগ প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এমন কি বৃটিশ পার্লামেন্টেরও গোচরীভূত করা হইত। ভাউ দাজী সাতিশয় তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার দেখিলে তিনি সর্বদাই দুর্বলের পক্ষ লইয়া প্রবলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন। একবার একজন দরিদ্র দরজীর নামে একজন ইংরাজ মিথ্যা অভিযোগ আনায় ইংরাজ বিচারক তাহাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেন। দরজী নির্দোষ ইহা জানিয়া ভাউ দাজী তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া উচ্চতর আদালতে অভিযোগ করেন। উচ্চতর আদালতের

বিচারে দরজীর নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ায় সে শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং পক্ষপাতদুষ্ট বিচারক উচ্চতর আদালতের নিন্দাভাজন হন। আর একবার ভাউ দাজী অনুরূপ উপায়ে একজন ধনী ও দুষ্ট মোহন্তের কোপানল হইতে একজন সত্যভাষী সাংবাদিককে রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য দরিদ্র ও অত্যাচারিতের পক্ষ অবলম্বন করিতে গিয়া ভাউ দাজী অনেক সময়ে নিজের সুনাম ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতেন, ইহাতে তাঁহার অর্থনাশও হইত।

যৌবনকাল হইতেই বিভিন্ন পুরাকীর্তিপূর্ণ স্থানসমূহে ভ্রমণ ও সংস্কৃত অধ্যয়ন ভাউ দাজীর ব্যসন ছিল। চিকিৎসা বৃত্তিতে সাফল্যলাভ করার পর প্রত্ন দ্রব্য ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন, ভারতের নানা স্থানে এই সব দ্রব্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন। ভগবানলাল ইন্দ্রজী নামে একজন বিদ্যোৎসাহী যুবক ভাউ দাজীর গবেষণা কার্যে সহায়তা করিতেন। ভাউ দাজী এই যুবককে অতিশয় স্নেহ করিতেন ও তাঁহার সকল সাংসারিক দায়-দায়িত্ব বহন করিতেন। ভাউ দাজীর সাহায্যপুষ্ট ভগবানলাল উত্তরকালে ভারতবিদ্যা-চর্চারক্ষেত্রে একজন দিক্‌পাল, বলিয়া পরিগণিত হন। ভাউ দাজী শেষ জীবনে যখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী সেই সময় তিনি সংবাদ পান যে, তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভগবানলাল নেপালের কোন স্থানে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ভাউ দাজীর নির্দেশেই ভগবানলাল প্রত্নানুসন্ধানকার্যে নেপালে প্রেরিত হন। ভগবানলালের পীড়ার সংবাদ পাইয়াই ভাউ দাজী তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ ইউরোপীয় সুহৃদকে ডাকিয়া পাঠান ও যে কোন উপায়ে ভগবানলালের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাইতে অনুরোধ জানান। বন্ধুটি জানান যে, নেপালের কোন্ দুরূহ দুর্গম স্থানে ভগবানলাল আছেন তাহা সঠিক জানা না থাকায় এইরূপ কোন সাহায্য অসম্ভব। ভাউ দাজী তাঁহাকে বলেন যে, নেপালের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে দিয়া নেপালময়

তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া ভগবানলালকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করাইতে হইবে, ইহার জন্য তিনি সর্বস্ব ব্যয় করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন—তবে যেহেতু এই কার্য শুধু নেপালস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মাধ্যমেই সম্ভব এই জন্যই তিনি ইউরোপীয় বন্ধুটির সহায়তা চান। ইউরোপীয় বন্ধুটি নিরুপায় হইয়া নেপালস্থ রেসিডেন্টের শরণাপন্ন হন ও এই অনুসন্ধানের সাফল্যের সহিত ডাঃ ভাও দাজীর জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত বলিয়া তাঁহাকে জানান। অতঃপর রেসিডেন্ট নেপালের অরণ্য-পর্বত মন্থন করিয়া পীড়িত ভগবানলালের সন্ধান করিয়া তাঁহার চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা করেন। যথা সময়ে ভাউ দাজীকে এই সংবাদ জ্ঞাত করা হইলে তিনি নিরুদ্‌বিগ্ন হন, এবং তাঁহার রোগেরও কিঞ্চিৎ উপশম হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় গুরুশিষ্যে আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। ভগবানলালের বোম্বাই প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই ভাউ দাজী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

কীর্তিমান চিকিৎসক, রাজনীতিক নেতা ও জনসেবকরূপে ডাঃ ভাউ দাজী সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ভাউ দাজী মৃত্যুর প্রায় শতবর্ষ পরেও বিদ্বৎ সমাজে ভারতবাসীদের মধ্যে ভারতবিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রবর্তক ও দিক্‌পালরূপে একটি বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ আসনের অধিকারী হইয়া আছেন।

প্রথম জীবনেই ভাউ দাজী স্বাধীনভাবে সংস্কৃতচর্চা আরম্ভ করেন, সংস্কৃত চর্চা করিতে করিতে তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। বোম্বাই প্রদেশের অজন্তা গুহাস্থিত লিপিগুলির তিনিই প্রথম পাঠোদ্ধার করেন। ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক যখন অজন্তা গুহা পরিদর্শন করিতে যান তখন সরকারী অনুরোধে ডাঃ ভাউ দাজীকে তাঁহার সঙ্গী হইতে হয়। ভাউ দাজীর পাণ্ডিত্যে লর্ড নর্থব্রুক এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে, ভাউ দাজীর

দীর্ঘস্থায়ী পীড়াকালে তিনি ভাউ দাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন—যেন তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যহ তাঁহাকে (বড়লাটকে) সংবাদ দেওয়া হয়। অতঃপর ভাউ দাজীর ভ্রাতা বড়লাটকে প্রত্যহ ভাউ দাজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করিতেন। জুনাগড় পর্বত গাত্রে শক ক্ষত্রপ রুদ্র দমন ও সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক উৎকীর্ণ লিপির যথাযথ পাঠ ও অনুবাদ, কাথিয়াবাড় সন্নিহিত জাসদানের স্তম্ভ লিপি, অমরনাথ মন্দির লিপি, আনাম কোণ্ডার রুদ্রদমন লিপি, ভিটরিলাট লিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার ও যথাযথ মর্মোদ্ঘাটনে ভাউ দাজী বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন। প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপি হইতে দেবনাগরী লিপি প্রবর্তনের পূর্বে সংস্কৃত সংখ্যা সঠিক কিভাবে লিখিত হইত এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব ভাউ দাজীর। প্রাচীন লিপি বিশারদ জেমস প্রিন্সেপও এ কার্যে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনকালে গুপ্তাব্দ নামে একটি অব্দ প্রচলিত ছিল, ঐতিহাসিকেরা ইহা পূর্বে জানিতেন না। জেমস প্রিন্সেপ জুনাগড় লিপিগুলির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে না পারায় ভাও দাজী এইগুলির পাঠোদ্ধার করেন ও গুপ্তেরা যে নিজেদের নামে অব্দ প্রচলিত করেন তাহা আবিষ্কার করেন। ভাউ দাজী গুপ্ত অব্দ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বল্লভাব্দেরও সঠিক কাল নির্ণয় করেন। জাসদান লিপি হইতেও তিনি কয়েকজন গুপ্ত-রাজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। দাজী কর্তৃক অজন্তা গুহার লিপিগুলি পাঠোদ্ধারের ফলে ভারতের বহু রাজবংশের ইতিহাসের উপাদান আবিষ্কৃত হয়। টলেমির ভারত বিবরণে টাইয়াসটেনস নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে, কোন একটি লিপিতে উল্লিখিত চাস্তানা নামক স্থানটিই টলেমি বর্ণিত স্থান—দাজী ইহাই প্রমাণিত করেন। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের ন্যায় প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধারেও ভাউ দাজী বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। শকযুগের মুদ্রাগুলির যথাযথ পাঠোদ্ধার দ্বারা শক ক্ষত্রপগণ

সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য তিনি সুধিমণ্ডলীর গোচরীভূত করেন। প্রাচীন লিপি ও প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধার ব্যতীত ভাউ দাজী কালিদাস, হেমাদ্রি, হেমচন্দ্র, মাধব ও সায়নাচার্য, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভট্টোৎপল, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন কবি ও পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করিয়া ইঁহাদের বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। ভাউ দাজী রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন, তাঁহার রচিত ১৭টি প্রবন্ধ এই সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়, বাকী ৩টি প্রবন্ধ লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়; তিনি এই সোসাইটি ও আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে ভাউ দাজীই সর্বপ্রথম বোম্বাই-এর শেরিফ নিযুক্ত হন (১৮৬৯-১৮৭১)। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। বোম্বাই-এর ভিক্টোরিয়া উদ্যানস্থিত পুরাবস্তু সংগ্রহশালাটি ভাউ দাজীর যত্নেই স্থাপিত হইয়াছিল।

কুষ্ঠরোগ প্রতিষেধক ঔষধটিকে অমোঘ করিবার উদ্দেশ্যে ভাউ দাজী বহুদিন যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত ছিলেন—গবেষণা-রত থাকা অবস্থাতেই তিনি অকস্মাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়েন। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর ভাউ দাজী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে বোম্বাই-এ পরলোকগমন করেন।

ভাউ দাজীর মৃত্যুর পর এই সর্বজনপ্রিয় সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতি ভাউ দাজী কর্তৃক সংগৃহীত ৩১১টি পুঁথি পেটিকা তাঁহারই স্মৃতি রক্ষার্থে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বোম্বাই শাখার হস্তে অর্পণ করেন।

দুঃখের বিষয় ভাউ দাজীর রচনার পরিমাণ অতি অল্প। অল্প

হইলেও ভারত-বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অবশ্যই অল্প নহে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুল্লার ভাউ দাজী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদিও ভাউ দাজী অল্পই লিখিয়াছেন তথাপি তাঁহার এই অল্প সংখ্যক রচনাই অন্যের লিখিত হাজার পৃষ্ঠা অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে।*

ডাঃ ভাউ দাজীর মৃত্যুর পর বোম্বাই রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় মন্তব্য করেন যে, "গত ২000 হাজার বৎসরের ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব লইয়া যিনিই আলোচনা করিতে যাইবেন তাঁহাকেই ডাঃ ভাউ দাজীর প্রবন্ধগুলি পড়িতে হইবে"।†

ডাঃ ভাউ দাজী কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধগুলি একত্রে সংগৃহীত হইয়া 'লিটারারী রিমেনস্ অফ ডাঃ ভাউ দাজী' নামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়[১]।

CONTENTS

1. On the Sanskrit Poet Kalidasa.
2. Ajanta Inscriptions.
3. Facsimile, Transcript and Translation of the Sah of Rudradaman inscription on a rock of Junagarh also one of Samudragupta on the northern face of the rock with some brief remarks on Sah, Gupta and Ballavi dynasties.

* "I always look upon Dr. Bhau Daji as a man who has done excellent work in life and though he has written little, the little he has written is worth thousands of pages written by others."—Prof. F. MaxMueller (1881).

† "No one who wishes to write a paper on the antiquities of the last two thousand years can do so without referring to Dr. Bhau Daji's writings." Dr. R. G. Bhandarkar in the Annual Meeting of the Bombay Royal Asiatic Society held on 23-1-1875.

১ The Literary Remains of Dr. Bhau Daji—Ed. by Ramchandra Ghosa, Preface by Dr. Thibaue, Calcutta, 1888.

4. Facsimile, Transcript and Translation with remarks on an inscription on a stone pillar at Jasdan in Kathiwar.
5. A brief summary on Indian chronology from the first century of the christian era to 12th century.
6. The inroads of Scythians to India.
7. Merutunga Theravali or genealogical and succession tables by Merutunga—a Jaina Pandit.
8. Notes on the age and works of Hemadri.
9. Notes on Mukundaraja, the oldest Maratha author.
10. Facimile, Transcript and translation of inscription in the Amarnath Temple of Kalyan.
11. Brief notes on Hemachandra or Hemacharya.
12. Brief notes on Madhava and Sayana.
13. Report on Photographic copies of inscriptions in Dharwar and Mysore.
14. Discovery of complete Mss. copies of Bana's Harsacharita.
15. Report on some Hindu coins.
16. Transcript and translation of King Rudradeva's inscription at Anamkonda.
17. Revised Translation of Inscription on the Bhitari Lat.
18. Revised Inscription on the Delhi Iron Pillar.
19. Brief Notes on the ages and authenticity of the works of Aryabhatta, Baraha Mihir, Bhattotpala and Bhaskaracharya.
20. The ancient Sanskrit numerals in the cave inscriptions on the Sah coins correctly made out with remarks on the era of Salivahana and Vikramaditya.

মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী

(১৮২১—১৮৯২)

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুনা নগরে এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে বাপুদেবের জন্ম হয়। মাতা সত্যভামা দেবী নৃসিংহ দেবের আরাধনা করিয়া পুত্রলাভ করায় নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় নৃসিংহদেব। প্রিয় অর্থে বাপু নামে আত্মীয়স্বজন কর্তৃক অভিহিত হইতে থাকায় পরবর্তীকালে এই শিশু বাপুদেব নামেই খ্যাত হন। বাপুদেবের পিতা সীতারাম পরাঞ্জপে টোনকেকার, একজন বেদশাস্ত্রপারঙ্গম পণ্ডিত ছিলেন। পুনায় মাতৃভাষা মারাঠীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাপুদেব পিতার সহিত নাগপুরে আসিয়া সংস্কৃত পাঠশালায় প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। "সিদ্ধান্ত-কৌমুদী" প্রভৃতি ব্যাকরণ গ্রন্থ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তিনি কান্যকুব্জ জাতীয় ব্রাহ্মণ ঢুণ্ডি-রাজ মিশ্রের নিকট ভাস্করাচার্য রচিত গণিতগ্রন্থ সিদ্ধান্ত-শিরোমণির "লীলাবতী" অংশ বিশেষভাবে পড়িতে থাকেন। শিশুকালেই বাপুদেব গণিতশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণিতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঢুণ্ডিরাজের শিক্ষায় অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু-গণিতে বাপুদেব বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইতিপূর্বেই তিনি নিজের চেষ্টায় ইউরোপীয় গণিতে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।

বাপুদেব যখন নাগপুরে হিন্দু-গণিত শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন এমন সময়ে দৈবক্রমে তিনি মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজপ্রতিনিধি (পলিটিক্যাল এজেন্ট) মিঃ লান্সেলট্ এট্‌কিন্‌সনের সহিত পরিচিত হন। সংস্কৃত বিশেষতঃ হিন্দু-গণিতে মিঃ এট্‌কিন্‌সনের

প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তরুণ-বালক বাপুদেবের গণিতে অসাধারণ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া গণিত-প্রেমিক মিঃ এট্‌কিন্‌সন্ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিদ্যানুরাগী এট্‌কিন্‌সনের মনে এই ধারণা জন্মে যে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলেই এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক উত্তরকালে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গণিতবেত্তা হইবে এবং হিন্দু-গণিতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবে। এট্‌কিন্‌সনের কর্মস্থল সিহোরে এই সময় একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ছিল। মিঃ এট্‌কিন্‌সনের সহায়তায় বাপুদেব সিহোরের সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন ও সেখানে দুই বৎসর কাল বিশেষভাবে রেখাগণিত ও বীজগণিত অধ্যয়ন করিয়া "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন। সিহোর মহাবিদ্যালয়ের পাঠাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য গণিতশাস্ত্রীয় পুঁথি ছিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাপুদেব এই গ্রন্থগুলি পাঠ করেন এবং হিন্দু গণিতে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। সিহোরে মধ্যাহ্নকালে বাপুদেব একটি বিদ্যালয়ে হিন্দীতে বীজগণিত ও রেখাগণিত (জ্যামিতি) শিক্ষা দিতেন, এই-ভাবে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ হইত।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাপুদেবের বয়স যখন মাত্র ২১ বৎসর তখন মিঃ এট্‌কিন্‌সনের চেষ্টায় কাশী সংস্কৃত কলেজে তিনি রেখাগণিত ও জ্যোতিষের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর এই মহাবিদ্যালয়ের প্রধান গণিতাধ্যাপক পণ্ডিত লজ্জাশঙ্করের মৃত্যু হইলে বাপুদেব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাপুদেব এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কাশীতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যাপনার অবসরে বাপুদেব গণিতচর্চায় ও পুস্তক রচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। এইভাবে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দীতে বহু গণিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত পুস্তকগুলির মধ্যে (১) রেখা গণিতম্, (২) ত্রিভুজ গণিতম্, (৩) ত্রিকোণমিতিতন্ত্রম্, (৪) সায়ন বাদঃ, (৫) প্রাচীন জ্যোতি-ষাচার্যাশয় বর্ণনম্, (৬) বিচিত্র প্রশ্নানাং সংগ্রহম্ সোত্তরম্, (৭) তত্ত্ব

বিবেক পরীক্ষা, (৮) কাশ্যাং মানমন্দিরস্থ যন্ত্র বর্ণনম্, (৯) ব্যক্তিগণিতম্ (Arithmetic), (১০) চলনকলনস্যা আদ্যা অধ্যায়স্থ সিদ্ধান্ত বোধকান্ বিংশতি সিদ্ধান্তাঃ, (১১) চাপীয় ত্রিকোণমিতিঃ, (১২) যন্ত্ররাজোপযোগী ছেদ্যকম্, (১৩) লঘুশঙ্কুশ্ছিন্নক্ষেত্রগুণম্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বরাহমিহির রচিত "সূর্য সিদ্ধান্ত" গ্রন্থটি বৈজ্ঞানিক রীতিতে লিখিত প্রথম হিন্দু-জ্যোতিষ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, এই গ্রন্থটি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত। অনেকে মনে করেন যে, পুর্বসূরীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ইহা রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকতা সর্বজন স্বীকৃত। বাপুদেব এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে "বিব্লওথেকা ইণ্ডিকা" সিরিজে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ সংখ্যক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে এই গ্রন্থমালায় (২৫নং) মূল সংস্কৃত "সূর্য সিদ্ধান্ত" গ্রন্থটি ফিটজেরাল্ড হল (Fitzerald Hall) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণটির সম্পাদনায়ও বাপুদেব সহায়তা করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে ভাস্করাচার্য রচিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির সর্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাপুদেবের পরম সুহৃৎ ও পৃষ্ঠপোষক মিঃ ল্যান্সেলট্ এট্‌কিন্‌সন্ কৃত এই অনুবাদও বাপুদেব কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাপুদেব ভাস্করাচার্য রচিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থের গণিত ও গোলাধ্যায় খণ্ড দুইটি ভাস্করাচার্যের স্বয়ং কৃত বাসনাভাষ্য, নিজকৃত টীকা-টিপ্পনী ও ইংরাজী ভূমিকা সহ সম্পাদন করিয়া বারাণসী হইতে প্রকাশ করেন। "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" হিন্দু-জ্যোতিষ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, এই গ্রন্থের কোন নির্ভরযোগ্য সংস্করণ ছিল না। প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থগুলির বহু

ভ্রম প্রমাদ অমুদ্রিত বহু পুঁথির 'পাঠ' পর্যালোচনা দ্বারা সংশোধন করিয়া বহু পরিশ্রমে বাপুদেব এই গ্রন্থটি সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থটি চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশী হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (J. A. S. B. Vol-28) একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বাপুদেব ইহা প্রতিপন্ন করেন যে, একাদশ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী নিবাসী ভারতীয় গণিতবেত্তা ভাস্করাচার্য "বিভেদক অন্তরকলন বিদ্যা" (Differential Calculas) পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি তাঁহার গণিতগবেষণায় এই বিদ্যাকে সম্যগ্‌রূপে ব্যবহার করেন। বাপুদেব শুধু হিন্দু-গণিতেই পারদর্শী ছিলেন না, ইউরোপীয় গণিত-বিদ্যাতেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বাপুদেবের এই প্রবন্ধ পাঠে বিচলিত হন, কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, অন্তরকলন বিদ্যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের একটি অতি যুগান্তকারী আবিষ্কার। বাপুদেবের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমতের প্রতিবাদ করা ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের পক্ষে সহসা সম্ভব হয় নাই। ইংল্যাণ্ড-এর রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে সোসাইটির ডিরেক্টর ভারতবিদ্ পণ্ডিত হোরেস হেমান উইলসন এ বিষয়ে একজন বিখ্যাত ইংরাজ গণিতজ্ঞ মিঃ উইলিয়ম স্পটিস ওয়োড্-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ইনি মন্তব্য করেন যে, বাপুদেবের ধারণা খুব নির্ভুল না হইলেও ইহা একেবারে ভ্রান্ত না হইতেও পারে, কারণ ভাস্করাচার্যের জ্যোতিষ গণনারীতির সহিত আধুনিক ইউরোপীয় গণনারীতির উল্লেখ-যোগ্য সাদৃশ্য আছে। ইংরাজ গণিতজ্ঞের এই অভিমতটি লণ্ডন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল (J. R. A. S, 1860)। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ভাস্করাচার্য সম্বন্ধে বাপুদেবের বহু তথ্যপূর্ণ আর একটি প্রবন্ধ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় (J. A. S. B. Vol 62, 1893)।

বাপুদেব হিন্দী ভাষাতে বীজগণিতম্ (১৮৫০), ব্যক্তগণিতম (১৮৭৫), ফলিত বিচারঃ, সায়নবাদানুবাদ পঞ্চাঙ্গোপপাদনম্ (পঞ্জিকা রচনা পদ্ধতি) ইত্যাদি কয়েকটি গণিত গ্রন্থ রচনা করেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গভর্নমেন্টের (ঐ সময়ে বর্তমান উত্তর প্রদেশ নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স নামে পরিচিত ছিল) ইচ্ছাক্রমে বাপুদেব হিন্দী ভাষাভাষী বিদ্যার্থীদের জন্য ব্যক্ত গণিত (এরিথমেটিক) ও বীজগণিত (য়্যালজেব্রা) ১ম ও ২য় ভাগ রচনা করেন। হিন্দী ভাষায় বীজগণিত (১ ভাগ) রচনার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গভর্নর মিঃ টমাসন্ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ্য দরবারে বাপুদেবকে ২০০০৲ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। বীজগণিতের দ্বিতীয়-ভাগ রচনা করার পর বাপুদেব লেঃ গভর্নর মুইরের নিকট হইতেও নগদ ১০০০৲ ও একজোড়া শাল পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

বাপুদেব ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গণনা করিয়া সংস্কৃত পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাপুদেব কর্তৃক ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চন্দ্রগ্রহণের নির্ভুল গণনায় মুগ্ধ হইয়া কাশ্মীর ও জম্মুর অধিপতি মহারাজা রণবীর সিংহ তাঁহাকে এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন।

যৌবনে উপনীত হইবার পূর্বেই গণিতজ্ঞরূপে বাপুদেবের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুধু দেশেই নহে বিদেশেও বিস্তৃত হয়। প্রাচীন হিন্দু গণিতবেত্তাগণের ও হিন্দুগণিতের গৌরব প্রচারে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বাপুদেবই সর্বপ্রথম অগ্রণী হন। সূর্য সিদ্ধান্তের ইংরাজী অনুবাদ ও সিদ্ধান্ত শিরোমণির সুসম্পাদন দ্বারা তিনি ইউরোপীয় ভারত-বিদ্‌দের নিকটও সমধিক আদরণীয় হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বাপুদেবকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্য (অনারারী ফেলো) মনোনীত করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিও তাঁহাকে অনুরূপভাবে সম্মানিত করেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাপুদেব শাস্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (ফেলো) পদ লাভ করেন। এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৬৩-১৮৬৫) প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্ ও সংস্কৃতজ্ঞ ডাঃ হেণ্ড্রীক কার্ন (ভট্ট কম্ব, ১৮৩৩-১৯১৭) অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভা ও গণনা দক্ষতার জন্য বাপুদেবকে "ভারতভূষণম্" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার বাপুদেবকে সি-আই-ই উপাধি দান করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার কর্তৃক বাপুদেব মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাপুদেব স্বেচ্ছায় কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রধান গণিতাধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী (১৮৬০-১৯১০) এই পদে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। উত্তরকালে দ্বিবেদী মহাশয়ও দেশে বিদেশে একজন অদ্বিতীয় গণিতজ্ঞরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গণিত ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য সকলের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে কাশীতে বাপুদেবের জীবনান্ত হয়। তাঁহার এক পুত্র গণপতিদেব শাস্ত্রী গণিতজ্ঞ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

(১৮২২—১৮৯১)

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা নগরীর শুঁড়া পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন কায়স্থ পরিবারে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জন্মেজয় মিত্র একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।

গৃহে বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল পাথুরিয়াঘাটায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে দুই বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া আরও দুই বৎসরকাল তিনি হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। এখানকার পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্ররূপে যোগদান করেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররূপে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন, কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মনান্তর হওয়ায় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করেন।

মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া রাজেন্দ্রলাল কিছুদিন আইনও অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিন চাঁর বৎসর তিনি স্বাধীনভাবে ভাষা চর্চায় মনোনিবেশ করেন ও ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় তিনি ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সী, হিন্দি, উড়িয়া ও উর্দু ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০ বেতনে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। দশবৎসরকাল তিনি এই পদে কার্য করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া রাজেন্দ্রলাল বহু খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসেন এবং

সোসাইটির বিপুল গ্রন্থ-সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে নাবালক জমিদারগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক কলিকাতায় ওয়ার্ডস ইন্সটিটিউসন নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজেন্দ্রলাল মাসিক ৩০০ বেতনে এই নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের ডিরেক্টার বা পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং রাজেন্দ্রলাল এই পদ হইতে পেন্সনসহ অবসর গ্রহণ করেন।

প্রথম কর্মজীবনে দশবৎসর এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মচারী থাকিবার পর এই কর্ম ত্যাগ করিলেও আজীবন রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সদস্য, সম্পাদক (১৮৫৭, ১৮৬৫), সহ-সভাপতি, (১৮৬১—৬৫, ১৮৭০—৮৪, ১৮৮৬—১৮৯১), ভাষাতত্ত্ব বিভাগীয় সম্পাদক (১৮৬৬—৬৮) ও সভাপতিরূপে (১৮৮৫) সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হন। ইহার শতাধিক বর্ষকাল পূর্বে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় পণ্ডিতের ভাগ্যে এই সম্মান লাভ ঘটে নাই। দশ বৎসরকাল এশিয়াটিক সোসাইটির বেতনভুক্ কর্মী ও অবশিষ্ট জীবনে এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন উচ্চপদাধিকারী রাজেন্দ্রলালের জীবনের মুখ্য সাধন-পীঠ ছিল এই এশিয়াটিক সোসাইটি। এশিয়াটিক সোসাইটি তথা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সহিত রাজেন্দ্রলালের নাম এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একের কথা বাদ দিয়া অন্যের কথা ভাবা যায় না। রাজেন্দ্রলালের জীবনের কর্মক্ষেত্র ছিল বহুবিস্তৃত, এই বহুবিস্তৃত কর্মজীবনের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চাই তাঁহার জীবনে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌রূপে রাজেন্দ্রলালের সাধনা শুধুমাত্র কোন একটি বিশেষ বিভাগে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ইংরাজী

ভাষায় রাজেন্দ্রলাল রচিত মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে উড়িষ্যার ইতিহাস, বুদ্ধগয়া, এবং ভারতীয় আর্য এই তিনখানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[১-৩]। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস ও বুদ্ধগয়ার ইতিহাস রচনাকালে রাজেন্দ্রলাল এই সব স্থান ফটোগ্রাফার এবং নক্সা অঙ্কনকারী সঙ্গে লইয়া বার বার পরিদর্শন করেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অধীত সংস্কৃত গ্রন্থাদির সাক্ষ্য সহকারে এই পুস্তক দুইটিতে তিনি তাঁহার অভিমতগুলি লিপিবদ্ধ করেন। শিলালেখাদির পাঠোদ্ধার দ্বারাও তাঁহার বক্তব্যগুলি দৃঢ়ীভূত করা হয়।

রাজেন্দ্রলাল তাঁহার 'ভারতীয় আর্য' নামক ইংরাজী পুস্তকটিতে ভারতীয় আর্যদের প্রথম হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত অবস্থার পর্যালোচনা করেন। ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বস্ত্রালঙ্কার, গৃহসজ্জা, বাদ্য, যান-বাহন, আহার্য, গৃহপালিত পশু, রাজনীতি, পারলৌকিক কৃত্য, উপভাষা, প্রাকৃত ভাষা, সম্রাট্ অশোক, আদিম আর্যজাতি, সংস্কৃত লিপির উৎপত্তি, বাঙ্গলার পাল ও সেন রাজবংশ, প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়গুলি এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় ১২ খানি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলির মধ্যে অধিকাংশই সর্ব প্রথম মুদ্রণ, ইহাদের অনেকগুলি একাধিক খণ্ডে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল[৪-১৫]। মূল পুস্তক সম্পাদন ব্যতীত

১ The Antiquities of Orissa in 2 Vols, Calcutta, 1875, 1880; Reprinted in 1961 in Indian Studies—Past and Present

২ Buddha Gaya, the hermitage of Sakya Muni, Calcutta, 1878.

৩ Indo-Aryans in 2 Vols, Calcutta, 1881.

৪ কবি কর্ণপুর কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ১৮৫৩—৫৪

৫ সায়ন ভাষ্যসহ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১—৩ খণ্ড, ১৮৫৯, ১৮৬২, ১৮৯০।

৬ সায়ন ভাষ্যসহ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১৮৬৪—৭১

৭ অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণ, ১৮৭০—৭২

৮ ত্রিভাষ্যরত্ন টীকাসহ তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্য, ১৮৭২

রাজেন্দ্রলাল "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় ছান্দোগ্য উপনিষদ্, পতঞ্জলির যোগসূত্র ও ললিত বিস্তরের (আংশিক) ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বিশেষতঃ বিদেশী পণ্ডিতদের পক্ষে এই অনুবাদগুলি সবিশেষ উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়[১৬-১৮]। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল দ্বারা লিখিত "ললিত বিস্তরের ভূমিকা" নামীয় মৌলিক তথ্যবহুল রচনাটিও উল্লেখযোগ্য[১৯]।

এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মীরূপে রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির মিউজিয়মে রক্ষিত প্রত্নদ্রব্যাদির একটি বিবরণীমূলক তালিকা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন[২০]। ইহার পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (১—২৫ খণ্ড) প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন[২১]। এই বৎসর সোসাইটি-পাঠাগারে রক্ষিত মানচিত্র ও পুস্তকাদির বিবরণও তৎকর্তৃক সংকলিত হয়[২২]।

৯ অগ্নিপুরাণ, ১—৩ খণ্ড, ১৮৭৩—'৭৬—'৭৯

১০ সায়নভাষ্যসহ ঐতরেয় আরণ্যক, ১৮৭৫—'৭৬

১১ ললিত বিস্তর—১৮৫৩—১৮৭৭

১২ বায়ুপুরাণ—১—২ খণ্ড, ১৮৮০—১৮৮৮

১৩ কামন্দকীয় নীতিসার (অসম্পূর্ণ), ১৮৮৪

১৪ অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা, ১৮৮৭—৮৮

১৫ শৌনক কৃত বৃহদ্দেবতা, ১৮৮৯—৯২।

১৬ (English Translation) Chandogya Upanishad, 1854-1862.

১৭ Lalita Vistara (Incomplete)—Eng. Trans., 188 -1886 .

১৮ Joga Aphorisms of Patanjali—Eng. Trans. 1883.

১৯ An introduction to the Lalit Vistara, 1877.

২০ A descriptive Catalogue of curiosities in the Museum of the Asiatic Society of Bengal, 1849.

২১ Index to Vol I—XXIV of the Journal of the Asiatic Society, 1856.

২২ A Catalogue of Books and Maps in the Library of the Asiatic Society of Bengal—1856.

এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সোসাইটির পক্ষ হইতে যে শতবর্ষ সমীক্ষা পুস্তক প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল তাহার প্রথম খণ্ডটি প্রণয়ন করেন। এই খণ্ডে সোসাইটির শতবর্ষ-ব্যাপী ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে[২৩]।

দুষ্প্রাপ্য পুঁথিসমূহের বিবরণীমূলক তালিকাসংকলন রাজেন্দ্র-লালের জীবনের একটি অবিনশ্বর কীর্তি। এই বিবরণীমূলক তালিকাগুলি (Descriptive catalogues) বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থকে চির বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছে, যে সমস্ত পুস্তকের অস্তিত্ব কাহারও জানা ছিল না, অথবা নাম মাত্র জ্ঞাত ছিল ঐগুলি রাজেন্দ্রলালের বিবরণীভুক্ত হইয়া বিদ্যোৎসাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তরকালে পণ্ডিতেরা ঐগুলি ব্যবহার করিয়াছেন এবং কোন কোন পুস্তক পরে মুদ্রিত হইয়াছে। নেপালের বৌদ্ধসংস্কৃত-সাহিত্য বিশেষভাবে রাজেন্দ্রলালের চেষ্টাতেই পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে[২৪]।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে রাজেন্দ্রলাল নয়টি বৃহৎ খণ্ডে দেশের নানাস্থানে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণমূলক তালিকা সঙ্কলন করেন[২৫]।

পরবর্তীকালে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে এই সিরিজে আরও ছয়খণ্ড সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী রাজেন্দ্রলালের যোগ্য উত্তর-সাধক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রাপ্তব্য পুঁথি ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে

২৩ Part 1 (History) of the Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal—(1784—1883): 1885.

২৪ The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, 1882.

২৫ Notices of Sanskrit Manuscripts Vols-I-IX, 1870—1888.

সংগৃহীত শুধুমাত্র ব্যাকরণ বিষয়ক পুঁথিগুলির বিবরণী প্রকাশ করেন[২৬-২৭]।

প্রধানতঃ রাজেন্দ্রলাল ও এশিয়াটিক সোসাইটিস্থ তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় ভারত সরকার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কিছু অর্থ বরাদ্দ করেন। এই অর্থে এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কার্য চলিতে থাকে। পরে প্রাদেশিক সরকারের অর্থ সাহায্যে মুখ্যতঃ রাজেন্দ্রলালের নির্দেশে এই পুঁথি সংগ্রহ কার্য অব্যাহত থাকে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল এই প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করেন[২৮]। এই বৎসরই তিনি বিকানীর রাজদরবারে রক্ষিত পুঁথিগুলিরও তালিকা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন[২৯]।

প্রাচীন পুঁথি বিশেষতঃ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম অগ্রগণ্য। ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ সঙ্কলন কার্যে স্বদেশীয় সকল শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালই ছিলেন পথিকৃৎ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান দেশস্থ বন (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ থিওডোর আওফ্রেকট, সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত ব্যুল্যর, জার্মান অধ্যাপক ভেবর্, ইংরাজ পণ্ডিত সিসিল বেণ্ডেল প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ কৃত প্রাচীন পুঁথি তালিকা বা বিবরণগুলি প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় বহু সহায়তা দান করিয়াছে।

২৬ A report on Sanskrit Mss-in Native Libraries, 1875.

২৭ A descriptive Catalogue of Sans. Mss. in the Library of the Asiatic Society of Bengal, P I, Grammar—1877.

২৮ Report on the operations carried on to the close of the official year 1879—80, for the discovery and preservation of Ancient Sanskrit Mss. in the Bengal provinces—1880.

২৯ A Catalogue of Sanskrit Mss. in the library of the H. H. the Maharaja of Bikaner—1880.

এই সব বৈদেশিক প্রাচ্যবিদ্যা-সাধকের বিবরণীগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই রাজেন্দ্রলাল এই কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, 'বিবরণী' প্রণয়ন, মূল পুস্তক সম্পাদন ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ অথবা ইংরাজী ভাষায় মৌলিক পুস্তক রচনাতেই রাজেন্দ্রলালের প্রাচ্যবিদ্যা সাধনা সীমিত হয় নাই। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও মুদ্রাতত্ত্বচর্চাতেও ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালকে পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ও কার্য বিবরণীতে (Proceedings) রাজেন্দ্রলালের শতাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।*

এই সব প্রবন্ধের মধ্যে ৫০টি প্রবন্ধ শিলালেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতি প্রাচীনলিপি সম্বন্ধীয় ও ১০টি প্রবন্ধ প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা বিষয়ক। বাকী নিবন্ধগুলি প্রাচীন চিত্র, মন্দির, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে লক্ষ্মণাব্দ নামে যে একটি অব্দ প্রচলিত আছে রাজেন্দ্রলালের গবেষণাতেই তাহার প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের জন্য রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গলাদেশসহ ভারতের নানা স্থানে বহুবার ভ্রমণ করেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণা পদ্ধতি সর্বপ্রথম রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক অনুসৃত হয়। প্রাচীন প্রত্নবস্তু ও প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্য প্রমাণগুলির সম্যক্ ব্যবহার তাঁহার গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম জীবনে রাজেন্দ্রলাল আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আইন ও

* (জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সূচীর জন্য Index to Publications of Asiatic Society—S. Choudury, Vol I, P 1, PP 206—208 দ্রষ্টব্য; Proceedings বা কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সূচীর জন্য উক্ত পুস্তকের Vol I, Part II. PP 423—427 দ্রষ্টব্য)।

চিকিৎসা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ না করিলেও আইনের যুক্তি ও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠা তাঁহার গবেষণাগুলিকে যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বহু ভাষা, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যও রাজেন্দ্রলালের পক্ষে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার বিভিন্ন প্রাঙ্গণে নিজ কীর্ত্তি চিহ্ন স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্র ও উপকরণগুলি পর্যাপ্ত ছিল না, এতৎসত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল স্বীয় অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভাবলে বহু বিচিত্র বিষয়ে নূতন নূতন আলোক সম্পাত করিয়া গিয়াছেন। নূতন নূতন উপকরণ আবিষ্কারের জ্ঞান-সমৃদ্ধ পরবর্তী কালের পণ্ডিতগণ রাজেন্দ্রলাল পরিবেশিত তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলিকে কচিৎ নস্যাৎ করিতে পারিয়াছেন।

জীবদ্দশায় রাজেন্দ্রলাল দেশ ও বিদেশে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে মধ্যমণি স্বরূপ বিবেচিত হইতেন। বহু বৈদেশিক প্রাচ্যবিদ্যা-বিদের সহিত তিনি বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস্, ইটালির এশিয়াটিক সোসাইটি, জার্মান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি, আমেরিকান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি, হাঙ্গেরীর রয়াল একাডেমি অফ্ সায়েন্স, ইথনোলজিক্যাল সোসাইটি অফ্ বার্লিন প্রভৃতি বিদেশীয় বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশিষ্ট সদস্যরূপে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর্ (১৮২৩-১৯০০), ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কোলব্রুক, লাজেন ও বুর্ম্ফের ন্যায় বিচারশীল মনীষার অধিকারীরূপে রাজেন্দ্রলালের প্রশস্তি করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

"He is a Pandit by profession but he is at the same time, a scholar and critic in our sense of the word···his arguments would do credit to any Sanskrit scholar in

England—our Sanskrit scholars in Europe will have to pull hard if with such men as Babu Rajendralala in the field, they are not to be distanced in the race of scholarship"

মাতৃভাষা বাঙ্গলার প্রতিও রাজেন্দ্রলালের সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হন। এই সমাজের আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীব সংস্থার বিবরণ, বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচনা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায়" সমৃদ্ধ বিবিধার্থ সংগ্রহে ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (বাং ১২৫৮—৫৯, কার্তিক—আশ্বিন ; ১২৫৯—১২৬০, পৌষ—অগ্রহায়ণ; ১২৬০—১২৬১, চৈত্র-ফাল্গুন ; ১২৬৪, বৈশাখ-চৈত্র ; ১২৬৫, বৈশাখ-চৈত্র ; ১২৬৬, বৈশাখ-চৈত্র)। বিবিধার্থ সংগ্রহের ৭ম ও শেষ খণ্ডের সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রকৃত পক্ষে "বিবিধার্থ সংগ্রহ"ই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম মাসিক পত্রিকা। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ এই মাসিক পত্রিকা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতেন —তাঁহার "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সোসাইটির আনুকূল্যেও রাজেন্দ্রলাল "রহস্য সন্দর্ভ" নামে একটি উৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই মাসিক পত্রের ৬৬টি সংখ্যা রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং সম্পাদনা করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি

মাসে এই মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভে রাজেন্দ্রলালের বহু রচনা স্বনামে এবং বিনা নামে প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গলা ভাষায়ও কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন[৩০-৩৫]। এই পুস্তকগুলি শিক্ষার্থীদের উপযোগীরূপে লিখিত হইয়াছে ; সম্ভবতঃ বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পুস্তকের অভাবের জন্যই মহাপণ্ডিত রাজেন্দ্রলালও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় পাঠ্যপুস্তক রচনাতেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ছাত্র ও জনসাধারণের ভূগোল জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য রাজেন্দ্রলাল কয়েকটি মানচিত্র প্রস্তুত করেন। বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা ও অন্যান্য স্থানের মানচিত্র প্রকাশ বিষয়ে পথ-প্রদর্শকের কৃতিত্বও রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। রাজেন্দ্রলাল "অশৌচ ব্যবস্থা" নামে বাঙ্গলায় একটি পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়, এই পুস্তকটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

পুরাতাত্ত্বিকরূপে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তৎকালীন বাঙ্গলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতা ও নেতৃত্ব একরূপ অপরিহার্য ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ মনস্বী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) উদ্যোগে "সারস্বত সমাজ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিষয়ক পরিভাষা নির্ধারণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলাল সভাপতি হিসাবে একক ভাবে কতকগুলি ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ধারণ করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সারস্বত সমাজ দীর্ঘায়ু হয় নাই। সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পূর্বে

---

৩০ প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪); ৩১ শিল্পিক দর্শন (১৮৬০);
৩২ শিবাজীর চরিত্র, ১৮৬০ ; ৩৩ মেবারের রাজেতিবৃত্ত, ১৮৬১ ;
৩৪ ব্যাকরণ প্রবেশ, ১৮৬২ ; ৩৫ পত্রকৌমুদী—১৮৬৩।

রাজেন্দ্রলাল ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন[৩৬]। দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হাণ্টার কমিশনের নিকট এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন (রিপোর্ট) পেশ করেন।

গবেষণা ও শিক্ষা প্রচার ব্যতীত রাজেন্দ্রলাল জনকল্যাণমূলক কার্যেও অগ্রণী ছিলেন। ১৮৬৩ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার পৌরকার্য একটি কমিটিদ্বারা চালিত হইত, এই কমিটির সদস্যদিগকে "জাস্টিস অফ্ দি পীস" বলা হইত। রাজেন্দ্রলাল প্রথম হইতে ১৫ বৎসর কাল এই কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্গঠিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতেও তিনি করদাতাদের ভোটে নবগঠিত পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পৌরসভার সদস্যরূপে তিনি কলিকাতা নগরীর উন্নতি ও নাগরিকগণের আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টিত থাকিতেন।

সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, প্রতিষ্ঠাকাল হইতে নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি চারি বৎসর কাল এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি (১৮৭৮-৮০, ১৮৮৭-৮৮, ১৮৯০-৯১) ও চারি বৎসর কাল (১৮৮১-৮৪, ১৮৮৬-৮৭, ১৮৮৯-৯০) ইহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসন কর্তাদের অনুগ্রহ ও প্রসাদলাভের আশায় দেশবাসীর স্বার্থ যাহারা বলি দেয় তাহাদের তীব্র বিরোধিতায় রাজেন্দ্রলাল সর্বদাই তৎপর ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অন্যতম নেতা হিসাবে রাজেন্দ্রলালের লক্ষ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি ও দেশবাসীর স্বার্থ-রক্ষা।

---

৩৬ A Scheme for the rendering of European Scientific Terms into vernaculars of India, 1877.

গভর্নমেণ্টের দোষ ত্রুটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনাও তাঁহার অভীষ্ট ছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কলিকাতা টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্রলাল এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বলেন যে, জাতির বিক্ষিপ্ত অংশগুলির মিলন সাধন তাঁহার বহুদিনের বাঞ্ছিত স্বপ্ন ছিল, এই অধিবেশনে সেই মিলনের সূত্রপাতে তিনি আনন্দিত।

বিভিন্ন সভাসমিতিতে রাজেন্দ্রলালের প্রদত্ত ভাষণগুলি একত্রিত করিয়া একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়[৩৭]। এই পুস্তকে মুদ্রিত ভাষণগুলি হইতে রাজেন্দ্রলালের মনীষা, দেশহিতৈষণা, নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ, এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ও প্রসিডিংস্ ব্যতীত Journal of the Royal Asiatic Society (London), Transactions of the Anthropological Society, Journal of the Photographic Society of Bengal, the Calcutta Review, Mookherjee's Magazine, Englishman, Daily News, Statesman, Phoenix, Citizen, Friend of India, Indian Field, Hindu Patriot প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় রাজেন্দ্রলালের বহু প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা, পত্র ও মন্তব্যাদি প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্রলালকে সম্মানসূচক L L. D উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে সি.আই.ই. (১৮৭৬), রায়-বাহাদুর (১৮৭৭) ও পরিশেষে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

---

৩৭ Speeches by Raja Rajendra Lal Mitra LL. D., C. I. E., (Ed by Raj Jogeshur Mitra), Calcutta, 1892.

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্রলাল কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। রাজেন্দ্রলালের দুইটি পুত্র ছিল। ইহাদের বংশধরগণ এখনও কলিকাতার শুঁড়া পল্লীস্থ পৈতৃক বাটীতে বাস করিতেছেন।

রাজেন্দ্রলালের ন্যায় বিচিত্র প্রতিভাধর পুরুষ আমাদের দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে রাজেন্দ্রলালের বহু সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। "বাংলা দেশের এই একজন অসামান্য মনস্বীপুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোন সম্মান লাভ করেন নাই" বলিয়া কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (জীবনস্মৃতি পৃঃ ১০৫—৭, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।)

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

(১৮৩৬—১৯১০)

১২৪৩ (ইং ১৮৩৬) বঙ্গাব্দের ১৯শে কার্তিক অবিভক্ত বাঙ্গলার মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত সেরপুর নামক স্থানে চন্দ্রকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহাদের কৌলিক উপাধি ছিল চক্রবর্তী। শৈশবে সুপণ্ডিত পিতার নিকট বাঙ্গলা শিখিয়া চন্দ্রকান্ত তাঁহারই নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও নব্যস্মৃতি পাঠ আরম্ভ করেন। পিতার অকাল মৃত্যুর পর শিক্ষা সমাপনের উদ্দেশ্যে তিনি নবদ্বীপে আসেন। এখানে তিনি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশের ও প্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায় ও কালীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের ধুরন্ধর পণ্ডিতদের নিকট দীর্ঘকাল নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চন্দ্রকান্ত—"তর্কালঙ্কার" উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে কিছুকাল তিনি তাঁহার জন্মস্থানে থাকিয়া দীননাথ ন্যায়-পঞ্চাননের নিকটও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া চন্দ্রকান্ত নবদ্বীপ হইতে সেরপুরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ও নিজে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রদের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। চন্দ্রকান্ত কোন অধ্যাপকের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েন নাই. এই বিষয়গুলি তিনি স্বাধীনভাবেই উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অচিরকালের মধ্যে চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় তাঁহার চতুষ্পাঠীতে বহু বিদ্যার্থীর সমাগম হইতে থাকে ও তিনি ছাত্রদিগকে সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। অগণিত ছাত্রদের অন্নসংস্থানও তাঁহাকে করিতে হইত।

সেরপুরে চতুষ্পাঠী পরিচালন কালে চন্দ্রকান্ত প্রবোধ প্রকাশ (ঢাকা, বাং ১২৭১) ও সতী পরিণয়ম্ (ঢাকা, বাং ১২৭১) নামে দুইখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। সতী পরিণয়ম্ কাব্যটি কবি কালিদাস রচিত কুমারসম্ভবম্-এর আদর্শে ১৬টি সর্গে লিখিত হয়।

পূর্ববঙ্গের সুদূর পল্লীতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনারত চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দীর্ঘকাল বিশেষ একটি অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই, ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ করে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অধ্যক্ষতাকালে সংস্কৃত কলেজে কলেজ-বহির্ভূত ছাত্রদের সংস্কৃত পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মহেশচন্দ্র সুদূর পূর্ববঙ্গবাসী পণ্ডিত চন্দ্রকান্তকে স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ নামে কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক চন্দ্রকান্তকে সংক্রান্তি সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিয়া পাঠান। চন্দ্রকান্ত এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিলে তিনি চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্যে সাতিশয় মুগ্ধ হন। প্রতাপচন্দ্র এই সময়ে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সামবেদীয় "গোভিল গৃহ্যসূত্র" গ্রন্থ এযাবৎ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই, এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কোন ভাষ্যও পাওয়া যায় নাই। প্রতাপচন্দ্রের অনুরোধে চন্দ্রকান্ত "গোভিল গৃহ্যসূত্রের" পুঁথি অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটি ভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন। ভাষ্যের প্রথম অধ্যায় রচিত হইলে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় উহা পঠিত ও আলোচিত হয়। এই সময় সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ও সোসাইটির অন্যান্য পণ্ডিতগণ চন্দ্রকান্তের ভাষ্যটির রচনা সৌকর্যে বিশেষ প্রীত হন এবং সভাষ্য "গোভিল গৃহ্যসূত্র" মুদ্রণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে চন্দ্রকান্ত স্বীয় ভাষ্যও সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকান্তের সম্পাদিত

"গোভিল গৃহ্যসূত্রম্" তাঁহার রচিত ভাষ্যসহ "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে সভাষ্য গোভিল গৃহ্য সূত্র প্রথম প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘকাল পর জার্মানী হইতে উহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ডাঃ ডোরপাট সম্পাদিত (১৮৮৫)। ইহার পর জার্মান পণ্ডিত ডঃ হারমান ওল্ডেনবুর্গ (১৮৫৪-১৯২০) এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ ম্যাক্সমুল্ল্যর্ সম্পাদিত "সেক্রেড্ বুকস্ অফ্ দি ঈস্ট" গ্রন্থমালায় প্রকাশ করেন (৩০ নং, ১৮৮৬)। চন্দ্রকান্ত সম্পাদিত সভাষ্য গোভিল গৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গোভিল গৃহ্যসূত্র প্রকাশের পর চন্দ্রকান্তের খ্যাতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও প্রচারিত হয়।

চন্দ্রকান্তের গুণগ্রাহী বন্ধুদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা বৃত্তি গ্রহণ করেন। দুইবার তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, দেশহিতৈষী বাগ্মীবর কৃষ্ণদাস পাল, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি হিতৈষিগণের নির্বন্ধাতিশয্যে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকান্ত সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অবসর গ্রহণে এই পদ শূন্য হয়। এই সময় হইতেই চন্দ্রকান্ত স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। চন্দ্রকান্তের কলিকাতায় অবস্থিতিতে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভূত উপকৃত হয়। সোসাইটির "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় চন্দ্রকান্তের সম্পাদনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—পরাশর স্মৃতি (পরাশর-মাধবঃ)—৩ খণ্ড (১৮৮৩-৯৯); উদয়নাচার্য রচিত "কুসুমাঞ্জলি প্রকরণম্"—ন্যায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, ২খণ্ড, (১৮৮৮-৯৫); খণ্ডদেব প্রণীত "ভাট্ট দীপিকা"—পূর্বমীমাংসা দর্শন বিষয়ক (১৯০০); "ত্রিকাণ্ড মণ্ডনঃ"—আপস্তম্বসূত্রার্থ কারিকা—আপস্তম্বীয় যজ্ঞ বিধি,

ভাস্কর মিশ্র সোমযাজী কৃত, (১৮৯৮-১৯০৩); "কাত্যায়ন কর্ম প্রদীপ" ঃ (১ম), স্বকৃত টিকাসহ (১৯০৯); গোভিল পরিশিষ্ট (১৯০৯); "গোভিল-সূত্র-গৃহ্য" সংগ্রহ (১৯১০); সায়নাচার্য কৃত—"কাল নির্ণয় টীকা" (১৮৮৭)।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি চন্দ্রকান্তকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্য (অনারারী মেম্বর) শ্রেণীভুক্ত করেন। ইতিপূর্বে একান্তভাবে সংস্কৃত চর্চাকারী আর কোনও দেশীয় পণ্ডিত এই সম্মানে ভূষিত হন নাই। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ হইলে জুবিলী উপলক্ষ্যে গভর্নমেণ্ট প্রাচ্যবিদ্যায় কৃতিত্বের জন্য, বিশেষ কৃতী পণ্ডিতদের "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দরবারে তাঁহাদের স্থান রাজা উপাধিধারিদের পরেই নির্দিষ্ট হয়। এই বৎসরই চন্দ্রকান্ত সহ আটজন ধুরন্ধর বঙ্গবাসী পণ্ডিতকে প্রথম এই উপাধি দেওয়া হয়। চন্দ্রকান্ত ব্যতীত অপর সাতজন উপাধি প্রাপ্তদের নাম—ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন (নবদ্বীপ), প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ), দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম শিরোমণি, রাখালদাস ন্যায়রত্ন ও তারিণীচরণ শিরোমণি (দ্রঃ ভারতবর্ষ, কার্তিক-১৩৫১)।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্যের প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মহেশচন্দ্র পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে নানা দেশীয় জ্যোতির্বিদ্‌দের মত সংগ্রহ করেন। পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে প্রশ্নাবলী রচনা করিয়া উহা তিনি নানাদেশের পণ্ডিতদের নিকট প্রেরণ করেন। মহেশচন্দ্রের অনুরোধে চন্দ্রকান্ত এই প্রশ্নপত্রটি সঙ্কলন করেন। মহেশ চন্দ্র স্মৃতিবিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে মহেশচন্দ্র রচিত প্রশ্নপত্রের উত্তরে অগ্রগণ্য স্মার্ত পণ্ডিত হিসাবে চন্দ্রকান্তের মতামতও সংগৃহীত হয়। মহেশচন্দ্র কৃত এই পুস্তক ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (দ্রঃ—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮)।

স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে স্বীয় উদ্যোগে চন্দ্রকান্ত "উদ্বাহ চন্দ্রালোক" (কলিকাতা, ১৮৯৭), "শুদ্ধি চন্দ্রালোক" (প্রায়শ্চিত্তবিধি, কলিকাতা, ১৯০৩) ও "ঔর্ধদেহিক চন্দ্রালোক" (শ্রাদ্ধ বিধি, কলিকাতা, ১৯০৬) নামে তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। স্মৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় চন্দ্রকান্ত সবিশেষ স্বাধীন চিন্তা প্রদর্শন করেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রকে যুগোপযোগীরূপে ব্যাখা করিবার চেষ্টা করেন (দ্রঃ "তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শাস্ত্রের গতানুগতিক ব্যাখ্যা করেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি রঘুনন্দনের ব্যাখ্যাকে স্বীয় যুক্তি দ্বারা অগ্রাহ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন"—সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান, সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, (পৃঃ-১৫২)।

চন্দ্রকান্ত রচিত "প্রবোধ-প্রকাশ" ও "সতী-পরিণয়" কাব্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি রঘুবংশের অনুকরণে ২৪ সর্গে "চন্দ্রবংশ" নামে একটি কাব্য রচনা করেন (কলিকাতা, ১৮৯২)। "কৌমুদী সুধাকর" নামে একটি নাটিকাও চন্দ্রকান্ত কর্তৃক রচিত হয় (কলিকাতা, ১৮৮৭)। চন্দ্রকান্তের অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয়পুস্তক "অলঙ্কার সূত্রম্" ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। বৈদিক ব্যাকরণ সম্বন্ধে কাতন্ত্র মতানুযায়ী চন্দ্রকান্ত "কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া" (কলিকাতা, ১৮৯৬) নামে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন—উহা পণ্ডিতমণ্ডলী, বিশেষতঃ অধ্যাপক ম্যাক্সমুল্যর কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়।

বৈশেষিক দর্শনে চন্দ্রকান্তের প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কণাদের বৈশেষিক দর্শনের একটি টীকা—"বৈশেষিক সূত্র" (কলিকাতা, ১৮৮৭) রচনা করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যোগদানের বহু পূর্বেই তিনি বৈশেষিক দর্শনের সূত্রগুলিকে কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়া "তত্ত্বাবলিঃ" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (কলিকাতা, ১৮৬৯)।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকান্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদ হইতে

অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয়ের পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দানের দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন বিশেষতঃ বেদান্ত বিষয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা দানের জন্য 'শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোসিপ্' লেক্চার প্রবর্তিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দক্ষিণায় পাঁচ বৎসরের জন্য চন্দ্রকান্তকে সর্ব প্রথম এই ফেলোসিপ্ লেকচারার নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম-এ ও প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া চন্দ্রকান্তকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ লেকচারার রূপে ১৮৯৮—১৯০২, এই পাঁচ বৎসরে লেকচারাররূপে চন্দ্রকান্ত ৪২টি বক্তৃতা দেন। তাঁহার সর্বসমেত ৩০টি 'লেকচার' দিবার চুক্তি ছিল। প্রথম বৎসরে তিনি সাধারণভাবে দর্শন সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেন। বাকী ছয়টি বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল বৈশেষিক (দুইটি), ন্যায় (একটি) সাংখ্য (একটি) ও পাতঞ্জল (যোগ) দর্শন (একটি)। সাধারণ ভাবে অপরাপর হিন্দু দর্শনের আলোচনা শেষ করিয়া পরবর্তী ভাষণগুলির বিষয়বস্তু বেদান্ত দর্শনের উপর নিবদ্ধ করা হয়। তাবৎ হিন্দু দর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলির বিচার ও মীমাংসা অতি প্রাঞ্জলভাবে সাধারণের বোধগম্য বঙ্গভাষায় পরিবেশন রূপ সুকঠিন কার্য চন্দ্রকান্ত অতি নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করেন। এই কার্যে তিনি দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষাগুলিকে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত ও বোধগম্য করাইতে যে অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন—তাহা বিস্ময়জনক। চন্দ্রকান্তের পাঁচ বৎসরের লেকচারগুলি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলি বঙ্গভাষার বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় (লেকচারস অন্ হিন্দু ফিলজফি—হিন্দুদর্শন-বেদান্ত, ৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৯৮—১৯০২)। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভাষায় দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় পথিকৃতের সম্মান চন্দ্রকান্তের প্রাপ্য। চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্য ও বঙ্গভাষাপ্রীতি,

সংস্কৃতজ্ঞ নহেন এমন বঙ্গভাষীর নিকট তাবৎ হিন্দুদর্শনের রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কার, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ৪০ খানি গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত মাতৃভাষারও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। সাময়িক পত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষায় তিনি কতকগুলি নিবন্ধ প্রকাশ করেন—এইগুলি একত্রভাবে তাঁহার "শিক্ষা" নামক পুস্তকে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় (সেরপুর, ১৮৮২)। 'ছাত্রমণ্ডলীকে ভারতীয় শিক্ষাবিষয়িনী নীতির আভাস প্রদান' ছিল এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায় যে, চন্দ্রকান্ত স্ত্রী শিক্ষার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষারও তিনি সমর্থক ছিলেন, যদিও আচার-বিচারে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণকে নিন্দা করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। "শিক্ষা" গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রাচীন হিন্দুজাতি পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও বিদ্যাদান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তিনি ছাত্রদের চরিত্র গঠন, ব্যায়াম চর্চা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির অপরিহার্যতার উল্লেখ করিয়াছেন। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া যাহা লিখিয়াছেন—তাহা এখনও শিক্ষক সমাজের প্রণিধানযোগ্য বলা যাইতে পারে—'ছাত্রদের বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার জন্য আমরা কেবল তাহাদিগকে দোষী করিতে পারি না, শিক্ষকগণও উহার কিয়দংশ দোষভাগী। শিক্ষক যেমন ছাত্রের নিকট ভক্তিশ্রদ্ধা পাইবার উপযুক্ত, ছাত্রও সেইরূপ শিক্ষকের নিকট স্নেহ-মমতা পাইবার অধিকারী। বর্তমান শিক্ষকদের মধ্যে এমত অনেক আছেন, যাঁহারা ছাত্রের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ।······যে ছাত্রগণ দেশের অবলম্বন, তাহাদিগকে মানুষ করিবার গুরুভার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে—ইহা তাঁহারা স্মরণ করিলে আর ক্ষোভের কারণ থাকে না (শিক্ষা—পৃঃ ৮২)।'

দেশীয় প্রথায় শিক্ষিত হইলেও, চন্দ্রকান্ত জ্ঞান-সাধনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুলভ বিচার বুদ্ধির ধারা অনুসরণ করিতেন। কোনরূপ বাঁধাধরা সংস্কার তাঁহার রচনাগুলিকে পক্ষপাতদুষ্ট করে নাই।

ব্যক্তিগত জীবনে চন্দ্রকান্ত নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার বিনয়, শিশুসুলভ সারল্য ও মার্জিত ভদ্রভাষণ পরিচিত মাত্রকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। দেশের বহু গণ্যমান্য মনীষী তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিনি বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ম্যাক্সমুল্যর কাউয়েল, রোস্ট্ বেণ্ডেল প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চন্দ্রকান্তের বিশেষ গুণমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন।

১৩১৬ (ইং ১৯১০) বঙ্গাব্দের ২০শে মাঘ চন্দ্রকান্ত কাশীধামে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেন।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর
(১৮৩৭-১৯২৫)

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের মালোয়া নামক স্থানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামান্ত করণিকের কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। রত্নগিরি বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ বোম্বাই-এর এলফিন্‌স্টোন কলেজে প্রবেশ করেন ও বিশেষ যত্নের সহিত ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও গণিত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে কৃতিত্বের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে পুনা ডেকান কলেজের "ফেলো" নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা মিঃ হাউয়ার্ডের সহিত রামকৃষ্ণের পরিচয় স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণের বিদ্যা ও তীক্ষ্ণ ধী লক্ষ্য করিয়া মিঃ হাউয়ার্ড তাঁহাকে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে প্ররোচিত করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই নিয়ম হয় যে, সমুদয় বৃত্তিভোগী ছাত্রগণকে (ফেলো) বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত পাঠ্য-তালিকানুযায়ী পরীক্ষা দিতে হইবে। নূতন নিয়ম অনুযায়ী ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে চারিজন ছাত্র বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকত্বের (বি. এ. ডিগ্রী) গৌরব অর্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ গোপাল অন্যতম, দ্বিতীয়জন ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে। উত্তর কালে ইনি রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বি. এ. ডিগ্রীলাভের পর বৎসরেই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় বিষয়েই পরীক্ষা দিয়া এম.এ. ডিগ্রী পান। এই বৎসর তিনি হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু দেশ, বর্তমানে

পাকিস্তানের অন্তভুক্ত) সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রত্নগিরি সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, প্রথম জীবনে তিনি এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ গোপাল বোম্বাই এলফিন্স্টোন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগে, কখনও বোম্বাই কখনও বা পুনায়, সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে কর্ম করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পুনার ডেকান কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ হইতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস চ্যান্সেলর) নিযুক্ত হন ইহার বহু পূর্ব হইতেই তিনি সিণ্ডিকেটের সদস্য হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারার সহিত জড়িত থাকিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ গভর্নর জেনারেলের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদলাভ করেন। পরবৎসর হইতে চারি বৎসর কাল তিনি বোম্বাই-এর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক তিনি সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কে-সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

কর্মজীবনে রামকৃষ্ণ বোম্বাই-এর সরকারী শিক্ষা বিভাগে উচ্চ বেতনে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। একজন শিক্ষাবিদ্ রূপে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যত্ব লাভও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। ইহা তাঁহার বাহ্য পরিচয়; একজন অদ্বিতীয় ভারতবিদ্যাসাধক রূপেই তাঁহার প্রকৃত খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডেকান কলেজের "ফেলো" থাকা কালেই তিনি সযত্নে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন ও অচিরকালের মধ্যেই উত্তম রূপে উহা শিক্ষা

করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থীদের উপযোগী দুইটি উত্তম সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন, এই রীডার দুইটি শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া রামকৃষ্ণ সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধটি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখায় পঠিত হইলে তিনি ভারততত্ত্ববিদ্‌রূপে খ্যাতি লাভ করেন। ইতিপূর্বেই সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতের নিপুণ অধ্যাপকরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ হইতে আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যাসম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁহার নিকট আমন্ত্রণ আসে কিন্তু তিনি উহাতে যোগদান করিতে না পারিয়া অধিবেশনে পাঠের জন্য নাসিকের শিলালিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়া দেন (ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টেলিস্টস্)। পরবর্তীকালে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সম্মেলনের ভিয়েনা অধিবেশনে যোগদান করেন ও একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। রামকৃষ্ণ গোপালের সম্মেলনে উপস্থিতি ও প্রবন্ধ পাঠ সম্মেলনকে এতদূর সাফল্যমণ্ডিত করে যে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ এই ভারতীয় পণ্ডিতকে প্রেরণ করার জন্য বোম্বাই প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় ভারত সরকারকে ধন্যবাদ দানের এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যভার পরিত্যাগ করার পর—রামকৃষ্ণ গোপাল পুনা নগরীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ভারত বিদ্যাচর্চাই তাঁহার অবসরকালের অবলম্বন ছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট পুনা নগরীতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়।

রামকৃষ্ণ গোপালের ভারতবিদ্যাচর্চার তিনটি ধারাই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমতঃ রামকৃষ্ণ গোপাল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগ সম্বন্ধেই প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেন। মালতী-মাধব নাটকটি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুসম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। ভেবর ও পেটারসনের মত খণ্ডন করিয়া

তিনি পতঞ্জলির সঠিক আবির্ভাব কাল নির্ণয় করেন। ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি ব্যুল্যর সম্পাদিত ভারতবিদ্যার বিশ্বকোষে একটি অতি সুদীর্ঘ নিবন্ধ (পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত) প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি প্রমাণ করেন যে ভারতের বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গীতা এবং উপনিষদ্ হইতেই এই দুই ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে। এই নিবন্ধে তিনি বৈষ্ণব মতবাদ কিভাবে যুগে যুগে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য, নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির সাধনায় বিবর্তিত হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার তাঁহাকে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের ভার অর্পণ করেন, ইহার পূর্বে পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত ব্যুল্যরের উপর ন্যস্ত ছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল ১৮৭৯ হইতে ১৮৯১ পর্যন্ত সংগৃহীত পুঁথির তালিকা ছয়খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টগুলি সংস্কৃত ভাষার বহু অজ্ঞাত পুস্তক ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যের আকর বলিয়া পরিগণিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় গবেষণা ব্যতীত রামকৃষ্ণ গোপাল ভারতীয় ভাষা তত্ত্বের গবেষণাতেও মনোনিবেশ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন (উইলসন্ ফিলোলজিক্যাল লেকচারস্)। রামকৃষ্ণ এই ভাষণাবলীতে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উপর সবিশেষ আলোকপাত করেন। অধ্যাপক উইন্‌ডিশ্ নামে এক জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই ভাষণগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে ঋগ্বেদের ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বর্তমান রূপ প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় ভাষার বিবর্তন আর কেহ ইতিপূর্বে এমনভাবে আলোচনা করেন নাই। উইলসন ফিলোলজিক্যাল লেকচারস্ প্রদত্ত হইবার প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পরে জার্মান ভাষাতত্ত্বজ্ঞ

অধ্যাপক উইনডিশের এই মন্তব্য সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব আলোচনাতেই রামকৃষ্ণের প্রতিভা আবদ্ধ থাকে নাই। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও প্রাচীন ইতিহাসের চর্চাতেও রামকৃষ্ণ সবিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার রচিত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস (হিষ্ট্রি অব্ ডেকান ১৮৮৪) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রথম পদক্ষেপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে এই পুস্তকের উপাদেয়তা কদাপিও হ্রাস পাইবে না।

দীর্ঘজীবি রামকৃষ্ণ বহু বৎসরের নিরলস সাধনায় বহু পুস্তক ও নিবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। বহু নূতন তথ্য ও চিন্তার জনকরূপে ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি সম্মানিত। তাঁহার প্রতিটি রচনা বিচার-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ। ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার প্রায় প্রতিটি রচনাই নূতন আলোকপাত করিয়াছে। রামকৃষ্ণের ভারতবিদ্যানিষ্ঠা বহু তরুণ গবেষককে ভারতবিদ্যাচর্চায় অনুপ্রাণিত করে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি রামকৃষ্ণকে সোসাইটির সম্মানিত সভ্য শ্রেণীভুক্ত করেন। কলিকাতা ও জার্মানীর গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৮৫) তাঁহাকে সম্মানসূচক পি. এইচ. ডি. উপাধিতে ভূষিত করেন। তদানীন্তন ভারত গবর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানগুলির উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনে রামকৃষ্ণ অতিশয় সৎ, উদারহৃদয় ও সত্য-প্রিয় ছিলেন। শেষ জীবনে পুনায় বাসকালে লোকে তাঁহাকে মহর্ষি বলিত। রামকৃষ্ণ অতিশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণা করিতেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সামাজিক নির্যাতনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশের

ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে বোম্বাই প্রদেশে "প্রার্থনা সমাজ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বাল্যবিবাহ নিরোধ, একেশ্বরবাদ প্রচার প্রভৃতি এই সমাজের কর্মসূচী ছিল। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বাঙ্গালী ব্রাহ্ম নেতাগণ বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের আমন্ত্রণে এই সব বিষয়ে বক্তৃতা দিতে প্রায়ই বোম্বাই গমন করিতেন। আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, প্রভৃতির চেষ্টায় এই "প্রার্থনা সমাজ" গঠিত হয়। রামকৃষ্ণ পুনায় বাসকালে পুনায় প্রার্থনা সমাজের নেতৃত্ব করিতেন। স্বনামখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "আমার আত্মকথা ও বোম্বাই প্রবাস" গ্রন্থে পুনার প্রার্থনা সমাজ ও উহার নেতারূপে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের জীবনব্যাপী ভারত-বিদ্যাচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপে রামকৃষ্ণের ৮০তম জন্মদিবস উপলক্ষে পুনায় "ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্ট্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্" নামে একটি প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সার দোরাব টাটা, সার রতন টাটা প্রভৃতি ধনকুবের এবং বোম্বাই গভর্নমেন্টের অর্থানুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্‌বোধন বোম্বাই-এর তদানীন্তন গভর্নর লর্ড উইলিংডন কর্তৃক ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই সম্পন্ন হয়। পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায় বোম্বাই সরকার ব্যুল্যর, পিটারসন ও রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রভৃতির সহায়তায় যে সব সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন তাহা এখানে রক্ষিত হয়, এতদ্‌ব্যতীত রামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সংগ্রহের তিন হাজার সংখ্যক পুঁথি ও পুস্তক রামকৃষ্ণ এই প্রতিষ্ঠানে দান করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষের প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র। এই প্রতিষ্ঠান হইতেই মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রণের পরিকল্পনা লওয়া হয়। বহু পণ্ডিতের দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সম্প্রতি এই মহাভারত ২৪ খণ্ডে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, "ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্ট্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্" হইতে তাঁহার সমগ্র রচনাবলী চারি খণ্ডে (ডিমাই সাইজ ১৭৫০ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে (*)। এই চারিখণ্ড পুস্তকে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের জীবনব্যাপী ভারত বিদ্যাচর্চার সম্যক্ পরিচয় নিহিত আছে। রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের (১৮৭৫-১৯৫০) নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত। ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন (কারমাইকেল প্রফেসার অফ্ এনসিয়্যাণ্ট্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি য়্যাণ্ড কালচার)। কয়েক বৎসর পূর্বে ইঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

---

*COLLECTED WRITINGS OF R. G. BHANDARKAR
Edited by Utgikar & Paranjape
(Published by B. O. R. I., Poona 1927-33)

CONTENTS

VOL I

I. Literary contributions :

1. Peep into the Early History of India. 2. Sankhya Philosophy. 3. Date of Mahabharata. 4. Aryans in the Land of Asuras. 5. Panini and the Geography of Afganisthan and Punjab. 6. Date of Patanjali and the king in whose reign he lived. 7. Note on Weber's letter regarding the date of Patanjali. 8. Reply to Weber. 9. Patanjali's Mahabhasya. 10. Mahabhasya and the Acharyas. 11. Interpretation of Patanjali's Mahabhasya. 12. Maurya passages in Mahabhasya. 13. Supplementary note to above. 14. Date of Patanjali—I. 15. Date of Patanjali—II. 16. Allusions to Krishna in Patanjali's Mahabhasya. 17. Vasudeva in Panini. 18. Bhababhuti and Rama. 19. Meaning of Ghata. 20. White and Black Yajurveda. 21. The Veda in India.

II. Contributions to Oriental Congresses :

1. Nasik cave-Inscriptions. 2. Ramanuja and Bhagavata. 3. Miscellaneous Notes. 4. Sankhayana and Asvalayana.

III. Literary Addresses :

1. Poona Oriental Conference Address. 2. My visit to Vienna Congress. 3. Critical, Comparative and Historical Method. 4. Lines of Fresh Research. 5. Institute Address 6. Mahabharata Address. 7. Convocation Address. 8. Addition to Convocation Address. 9. Aims and Ends of Education. 10. Ideal of an Indian Scholar.

IV. Reviews :

1. Review of Haug's Aitareya Brahmana. 2. Review of Goldstucker's Panini. 3. Review of Vincent Smith's Early History of India.

V. Obituary Notes :

1. Peterson. 2. Jackson.

VOL II

I. Search of mss reports for 1879—91.

II. Important portions from preface to first Book.

„ „ „ „ „ second book.

„ „ „ „ „ to Malati Madhaba.

III. Social Writings :

I. Social History of India. 2. 9th Social conference Address. 3. Social Reform Association Address. 4. Sholapur Address. 5. History of Child Marriage from Z.D.M.G. 6. Age of Marriage and its Consummation 7. Basis of Theism. 8. Position of Prarthana Samaj.

VOL III

I. Early History of Deccan.

II. Inscriptional Essays :

1. Bombay Royal Asiatic Society's Inscriptional Work. 2. Epoch of the Gupta Era. 3. Grant from Kathiwar. 4. Two Copper plates from Valabhi. 5. Valabhi Chronology. 6. New Valabhi copper plate and figured dates. 7. Copper plate grant of 5th Century. 8. Chalukya copper plate grant. 9. Rastrakuta and Kalacuri. 10. Karhad plates of Krishna III. 11. Deoli plates of Krishna III. 12. Brahmapuri Ruins. 13. Sanskrit Inscriptions from Java. 14. Note on Bricks from Mandalay. 15. Morbi Copper plate. 16. Inscription in Ganjam District. 17. Remarks on Merkara copper plate. 18. Hoernle and Gatha dialects. 19. Elapur King Rastrakuta. 20. Mandosur Inscription.

VOL IV

1. Vaisnavism, Saivism, etc. 2. Wilson Philological Lectures.

ভগবানলাল ইন্দ্রজী

(১৮৩৯—১৮৮৮)

বর্তমান গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জুনাগড়ের এক বিশিষ্ট নাগর ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ভগবানলাল ইন্দ্রজী জন্ম গ্রহণ করেন। এই পরিবার সংস্কৃত, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ চর্চা করিয়া পুরুষানুক্রমে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বাল্যকালে ভগবানলাল গুজরাটী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে এই সব বিষয়গুলিতেও শিক্ষা লাভ করেন। এই অঞ্চলে তৎকালে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা না থাকায় ভগবানলাল ইংরাজী শিক্ষা করিতে পারেন নাই; তাঁহার পারিবারিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। ভগবানলাল যে স্থানে বাস করিতেন উহা গীর্ণার গিরিমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, এবং গিরিগাত্রের নানা স্থানে সম্রাট্ অশোক, স্কন্দগুপ্ত, রুদ্রদমন প্রভৃতি নৃপতিদের অনুশাসন উৎকীর্ণ ছিল। এই সব প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি বারংবার দেখিতে দেখিতে ভগবানলাল বাল্যকালেই ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হন। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ জেম্‌স প্রিন্সেপ রচিত প্রাচীন বর্ণমালা সম্বন্ধীয় পুস্তকটির (টেবল্‌স অফ্ ইণ্ডিয়ান এলফাবেট্‌স) সাহায্যে তিনি প্রাচীন বর্ণমালাগুলির লিখন পদ্ধতি আয়ত্ত করেন ও তদ্দ্বারা তিনি শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। এইভাবে নিজের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভগবানলাল ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেন। জুনাগড়ের পলিটিকাল এজেণ্ট কর্নেল ল্যাঙ্গের গীর্ণার শিলালিপি সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল। বালক ভগবানলালকে পুনঃ পুনঃ গীর্ণার গিরিমালায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তিনিই তাঁহাকে জেম্‌স প্রিন্সেপের "টেবল্‌স অফ্ ইণ্ডিয়ান এলফাবেট্‌স" পুস্তকটি পড়িতে দিয়াছিলেন। কর্নেল ল্যাঙ্গের পরবর্তী পলিটিক্যাল

এজেণ্ট কিনলক ফরবেসের সহিতও ভগবানলালের পরিচয় স্থাপিত হয়, এই সময় ভগবানলাল যৌবন-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিনলকের সহিত বোম্বাই-এর প্রত্ন-প্রেমিক ডাঃ ভাউ দাজীর বন্ধুত্ব ছিল। প্রাচীন শাসনাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধারের কাজের জন্য ভাউ দাজী এই সময় একজন উপযুক্ত সহকারী সন্ধান করিতেছিলেন। কিনলকের অনুমোদনক্রমে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভগবানলাল ভাউ দাজীর সহকারীর কর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর ভাউ দাজীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল ভগবানলাল ভাউ দাজীর সহকারীরূপে কার্য করেন। ভগবানলালের সমুদয় ব্যয়ভার ভাউ দাজী সানন্দে বহন করিতেন। ভগবানলালকে ভাউ দাজী অতিশয় স্নেহের চক্ষেও দেখিতেন। ভাউ দাজীর সহকারী পদে বৃত হইয়া ভগবানলাল বিভিন্ন সময়ে গুজরাট অঞ্চল, উজ্জয়িনী, বিদিশা, এলাহাবাদ, ভিটরী সারনাথ, রাজপুতানা, মালব, ভূপাল, আগ্রা, মথুরা, বারাণসী, উত্তর ও দক্ষিণ বিহার, বাঙ্গলা, ওড়িশা, নেপাল প্রভৃতি স্থান এক বা একাধিক বার পরিদর্শন করেন। এই সব ভ্রমণ ব্যপদেশে তাঁহাকে অপরিসীম শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। এইসব স্থানে গমন করিয়া ভগবানলাল শিলালিপি প্রভৃতির যথাযথ প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতেন অথবা কাগজের উপর উহার ছাপ লইতেন এবং সম্ভব হইলে ঐ স্থান হইতে প্রাচীন পুঁথি ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি প্রত্ন-দ্রব্যও সংগ্রহ করিতেন। ডাঃ ভাউ দাজী ঐ গুলির পাঠোদ্ধার করিতেন, কোন ছাপ প্রতিকৃতি যথাযথ না হইলে শুদ্ধ পাঠের জন্য ভগবানলালকে পুনরায় ঐ স্থানে গিয়া শুদ্ধ প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে হইত অথবা সম্ভব হইলে ছাপ লইতে হইত। এছাড়া বোম্বাই-এ অবস্থিতিকালে ভগবানলালকে ভাউ দাজী কর্তৃক সংগৃহীত তাম্রপট্ট প্রভৃতি হইতে তত্রস্থ লিপির পাঠোদ্ধার করিতে হইত। ডাঃ ভাউ দাজীর ন্যায় সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তির পরিচালনাধীনে দীর্ঘকাল গবেষণারত থাকায় ভগবানলাল ভারততত্ত্ব বিষয়ের বিভিন্ন শাখায়

বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। উচ্চশিক্ষালাভ না করায় তাঁহার শিক্ষার যে অপূর্ণতা ছিল, তাহা এইরূপে পূরণ হইয়া যায়। ভাউ দাজীর সহকারিত্ব কালে ইংরাজী ভাষা ও প্রাকৃত ভাষায় তিনি পারদর্শিতা-লাভ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে ভগবানলালের অন্নদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণ ডাঃ ভাউ দাজী পরলোক গমন করেন। ভাউ দাজীর আত্মীয়গণ অতঃপর ভগবানলালের ভরণপোষণ ভার বহন করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় তিনি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন। ভাউ দাজীর উত্তরাধিকারিগণ ভাউ দাজীর অর্থ সাহায্যে ভগবানলাল কর্তৃক সংগৃহীত গবেষণার উপাদানসমূহ ঔদার্যবশতঃ ভগবানলালকেই ব্যবহার করার অনুমতি দান করেন। এইগুলির সাহায্যে ভগবানলাল গবেষণা কার্য চালাইতে থাকেন কিন্তু ইংরাজীতে তাঁহার এতদূর দক্ষতা ছিল না যে, উহা ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া বিদ্বৎমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ গেঅর্গ ব্যুল্যরের বোম্বাই অবস্থিতিকালে ভগবানলাল তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। ব্যুল্যর ভগবানলালের পাণ্ডিত্য দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং তাঁহার ইংরাজী রচনাগুলি পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করিয়া প্রচারযোগ্য রূপদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যুল্যরের সহযোগিতায় ভগবানলালের "গিরিগুহায় ক্ষোদিত লিপিসমূহের সংখ্যা লিখন রীতি" বিষয়ে একটি রচনা বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৭)। ব্যুল্যরের মধ্যস্থতায় ভগবানলাল বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ ও. কর্ডিংটনের সহিত পরিচিত হন। অতঃপর এই সোসাইটির মুখপত্রে প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে ভগবানলালের চারিটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর ভগবানলাল বোম্বাই রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির "সম্মানিত সদস্য" নির্বাচিত হন। ক্রমে একজন প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে দেশে বিদেশে তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয় এবং

ইউরোপের ভারতবিদ্যা-বিশারদগণ তাঁহার নিকট পত্রাদি প্রেরণ করিতে থাকেন। ভগবানলাল বন্ধুদের সাহায্যে এই সব পণ্ডিতদের সহিত পত্রালাপ অব্যাহত রাখিতেন।

ভাউ দাজীর কর্মত্যাগ করার পর স্বাধীন গবেষকরূপে ভগবানলাল মোট ২৮টি নিবন্ধ রচনা করেন, এতদ্ব্যতীত বোম্বে গেজেটিয়ার ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় প্রতিবেদনে (আর্কিওলজিকেল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া রিপোর্টস) তাঁহার বহু রচনা সন্নিবিষ্ট হয়। ভগবানলালের এই সব রচনায় বহু অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হয় ও এই সব তথ্যগুলি পববর্তী গবেষকদের নিকট অমূল্য বিবেচিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কোঙ্কন উপকূলে সোপারা (প্রাচীন নাম সূর্পারক) নামক স্থানে ভগবান বুদ্ধের কতিপয় স্মৃতিচিহ্ন ও সম্রাট অশোকের অষ্টম গিরিলিপি আবিষ্কার ভগবানলালের জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। উড়িষ্যার উদয়গিরি নামক গিরি গাত্রে খারবেল নরপতিগণ কর্তৃক ক্ষোদিত লিপিগুলিরও তিনিই প্রথম পাঠোদ্ধার করেন। মৌর্য রাজগণ যে একটি অব্দ (মৌর্যাব্দ) প্রচলন করেন তাহা ভগবানলালই প্রথম আবিষ্কার করেন। ভগবানলাল কর্তৃক নানাঘাট লিপি ও অন্ধ্রের প্রাচীন মুদ্রাগুলির আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার দ্বারা অন্ধ্র রাজ্যের ইতিহাস রচনার পথ সুগম হয়। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজবংশের কীর্তি-কাহিনীও ভগবানলাল কর্তৃক প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়।

ভগবানলাল নেপালে প্রাপ্ত ২১টি লিপির পাঠোদ্ধার করেন, ইহা হইতে নেপালের রাজবংশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়। ডঃ ব্যুল্যরের মতে নেপালের ইতিহাস রচনায় পথিকৃতের সম্মান ভগবানলালের প্রাপ্য। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ ভগবানলাল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় (হল্যাণ্ড) হইতে ভগবানলাল 'ডক্টর' উপাধি লাভ

করেন। ডাঃ ভাউ দাজীর আশ্রয়চ্যুত হওয়ার পর ভগবানলাল ডঃ ব্যুল্যর, ডঃ কর্ডিংটন, ডঃ জে. এম. কেম্পবেল, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডঃ বার্জেস প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং আপন বিদ্যাবত্তার প্রভাবে ইহাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব লাভ করেন। এই সব সুহৃদ্‌দের চেষ্টায় ভগবানলাল শুধু দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠাই লাভ করেন নাই, গবেষণা কার্যের মাধ্যমে তাঁহার জীবিকা অর্জনেরও ব্যবস্থা হয়। ভগবানলালের অনুরাগীবৃন্দ বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে ওয়ালকেশ্বর নামক স্থানে তাঁহাকে একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেন। ভগবানলাল এই গৃহেই ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ উনপঞ্চাশবর্ষ বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি গুজরাটের ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, এই ইতিহাসের তিন চতুর্থাংশ লিখিত হইবার সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এই রচনা তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভগবানলাল অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীও ছিল না—এই জন্য তিনি তাহার বাসভবনটি উইল করিয়া স্বাস্থ্যান্বেষীদের ব্যবহারের জন্য দান করিয়া যান। মৃত্যুর পর তাঁহার বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধীয় পুঁথিসমূহ, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, ও তাম্রশাসন প্রভৃতি তাঁহার উইল অনুসারে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখায় ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে দান করা হয়। ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত মুদ্রিত পুস্তকগুলি বোম্বাই-এর ভারতীয়দের জন্য স্থাপিত সাধারণ পাঠাগারের প্রাপ্য হয়। মৃত্যুর পূর্বে ভগবানলাল নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হন কিন্তু কাহাকেও তিনি নিজের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। ডঃ ব্যুল্যরের সহিত ভগবানলাল গুজরাটী ভাষায় পত্রালাপ করিতেন,একটি পত্রে ভগবান-লালের আর্থিক দুরবস্থার আভাস পাইয়া ডঃ ব্যুল্যর জুনাগড় দরবার হইতে ভগবানলালের জন্য সাহায্য প্রাপ্তির চেষ্টা করেন। ডঃ ব্যুল্যরের চেষ্টা ফলবতী হইবার পূর্বেই ভগবানলালের মৃত্যু হইয়াছিল।

যে সব ভারতীয় ও অভারতীয় পণ্ডিতের চেষ্টায় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে, ভগবানলালের নাম তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। স্কুল কলেজের শিক্ষা-বঞ্চিত ভগবানলাল একান্ত ভাবে আপনার চেষ্টায় জ্ঞানলাভ করিয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতবিদ্যা-বিশারদ রূপে তাঁহার নাম আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে। ডঃ ভগবানলালের সম্পূর্ণ রচনা সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

I. Published in the Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society :

(1) Gadhia Coins of Gujarat and Malwa. (2) Revised Facsimile, Transcripts and Translation of Inscriptions. (3) On Ancient Nagari Numeration from an Inscription at Naneghat. (4) A new Andhrabhritya King, from a Kanheri Cave Inscription. (5) Copper Plate of the Sidahara dynasty. (6) Coins of the Andhrabhritya Kings of Southern India. (7) Antiquarian Remains at Sopara and Padan. (8) A new copper plate grant of the Rastrakuta dynasty found at Naosari. (9) New copper plate grant of the Rastrakuta Dynasty. (10) A copper plate grant of the Traikutaka King. (11) Transcript and Translation of the Bhitari Lat Inscription. (12) An Inscription of King Asokavalla.

II. The Indian Antiquary :

(13) Ancient Nagari Numerals, with a note by Dr. Buhler. (14) The Inscription of Rudradaman at Junagad. (15) The Shaiva Prakrama. (16) Inscriptions from Nepal. (17) Inscriptions from Kam or Kamvan. (18) The Inscriptions of Asoka. (19) The Kwhnan Inscriptions of Skandagupta. (20) An

Inscription at Gaya. (21) A Bactro-Pali Inscription of Siahas. (22) A new Yadaba Dynasty. (23) A new Gujrat copper plate grant. (24) Some consideration on the History of Nepal edited by Dr. Buhler.

III. Proceedings of the International Congress of Orientalists held at Leyden in 1883 :

(25) The Hathigumpha and three other Inscriptions in the Udaigiri caves.

IV. Transactions of the seventh International Oriental Congress at Vienna :

(26) Two new Chalukya Inscriptions.

V. Bombay Gazetteers :

(27) Portions relating to archaeology in different volumes.

VI. In separate and miscellaneous forms :

(28) Inscriptions from cave temples of Western India with descriptive notes edited by Dr. Burgess. (29) Contributions to Dr. Burgess' Archaeological Survey of India.

সত্যব্রত সামশ্রমী

(১৮৪৬—১৯১১)

বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে পাটনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যব্রতের পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাটনায় সেরিস্তাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে ইনি এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার পদে উন্নীত হন। রামদাসের পিতা পাটনা বিচারালয়ের বিচারপতি পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিহার রাজ্যে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। এই পরিবারের আদি বাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত ধাত্রী গ্রাম।

সত্যব্রতের পিতা সাতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বঙ্গদেশে বেদের চর্চা নাই, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরও অভাব, এইজন্য তিনি সত্যব্রতকে বেদ বিষয়ে সুশিক্ষিত করিতে মনস্থ করেন। উত্তর ভারতে বেদচর্চা কেন্দ্র কাশী। কাশীর পণ্ডিতেরা বাঙ্গালী ছাত্রদের বেদশিক্ষা দিতে উৎসাহী ছিলেন না। এইজন্য বাঙ্গালী ছাত্রেরা কাশীতে বেদাধ্যয়ন করিতে আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত। ইতিপূর্বে বর্ধমানাধিপতি ও কলিকাতার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সব বাঙ্গালী ছাত্রদের বেদ শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই উত্তমরূপে বেদশিক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বয়ং কাশীবাসী হইয়া পুত্রদের বেদশিক্ষার সুব্যবস্থার নিমিত্ত রামদাস অবসর গ্রহণান্তর সপরিবারে কাশীধামে বসবাস আরম্ভ করেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে উপনয়ন সংস্কারান্তে সত্যব্রতকে কাশীর সরস্বতী মঠে প্রেরণ করা হয়। প্রাচীন কালের আদর্শে গুরু গৌড়স্বামীর অধীনে সত্যব্রত সরস্বতী মঠে বাস করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। ধনীপুত্র সত্যব্রতকে মঠে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইত, গৌড়স্বামীর সহিত তাঁহাকেও সন্ন্যাসীর আদর্শে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় বাহির হইতে

হইত। গুরুগৃহে তিনি প্রথমে বিশ্বরূপ স্বামীর নিকট পাণিনি ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন।

অসাধারণ মেধা ও বিশ্বরূপ স্বামীর অধ্যাপনাগুণে অল্প কালের মধ্যেই সত্যব্রত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। অতঃপর সত্যব্রত গুজরাট দেশীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ নন্দরাম ত্রিবেদীর নিকট চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া সত্যব্রত সর্বশাস্ত্রে, বিশেষতঃ ব্যাকরণ ও বেদবিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গুরুগৃহে অবস্থিতিকালে গুরুর আদেশে তিনি অন্যান্য ছাত্রদেরও পাঠ শিক্ষা দিতেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিংশতি বর্ষ বয়সে সত্যব্রতের পাঠ সাঙ্গ হয়। অতঃপর তিনি কতিপয় ছাত্র সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর সহ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন, যে স্থানেই তিনি যাইতেন সেই স্থানেরই পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তিনি আলাপ আলোচনা করিতেন। স্থানীয় পণ্ডিতেরা তরুণ সত্যব্রতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ভারত ভ্রমণকালে সত্যব্রত বুন্দী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজসভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে বেদ বিষয়ে আলোচনা করেন। সত্যব্রতের বেদ পারঙ্গমতায় চমৎকৃত হইয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদন লইয়া বুন্দীরাজ সত্যব্রতকে "সামশ্রমী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় সত্যব্রত সামশ্রমী নামেই পরিচিত হন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কাশী প্রত্যাবর্তন করিয়া সত্যব্রত পিতৃগৃহেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, প্রত্যহ তাঁহার গৃহে শিক্ষার্থীর সমাগম হইত। সত্যব্রত বিনা পারিশ্রমিকে এই সব ছাত্রদের পড়াইতেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সত্যব্রত নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্রী ও মথুরানাথ পদরত্নের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। সত্যব্রতের বিবাহের ইতিহাস কৌতুকজনক।

কথিত আছে যে তরুণ সত্যব্রত বৃদ্ধ পণ্ডিত ব্রজনাথকে তর্কে পরাজিত করিলে ব্রজনাথ সত্যব্রতের পিতার নিকট এই অপমানের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সত্যব্রতের পিতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিযোগ শুনিয়া বড়ই বিব্রত বোধ করেন এবং এই অপমানের প্রতিকার কি ভাবে তিনি করিতে পারেন এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের পরামর্শ ভিক্ষা করেন। চতুর ব্রাহ্মণ প্রস্তাব করেন যে তাঁহার পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে সত্যব্রতকে তিনি ক্ষমা করিবেন, নচেৎ নহে। সত্যব্রতের পিতা এই সুখকর নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়া লইলে ব্রজনাথের পৌত্রীর সহিত সত্যব্রতের উদ্‌বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

বিবাহের পর সত্যব্রত কাশী হইতে "প্রত্নকম্রনন্দিনী" নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। বৈদিক সাহিত্যের প্রচারই এই অভিনব পত্রটির উদ্দেশ্য ছিল। আট বৎসর কাল (১৮৬৭—১৮৭৪) এই পত্র-সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কাজ সত্যব্রত একাই নিষ্পন্ন করিতেন। আর্থিক দিক হইতে সাফল্য না আসিলেও প্রত্নকম্রনন্দিনীর প্রসাদাৎ সমগ্র ভারতে এবং বহির্ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সত্যব্রতের বেদবিৎরূপে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়।

প্রত্নকম্রনন্দিনী প্রকাশ কালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধ্যক্ষতায় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সামবেদ সংহিতা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে সামবেদ ভারতবর্ষ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর অধ্যাপক বেনফি জার্মানীর লাইপজিগ নগরী হইতে সামবেদ সংহিতা (মূল) জার্মান অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ম্যাক্সমুল্ল্যর সম্পাদিত ঋগ্‌বেদের ন্যায় সামবেদ প্রথম প্রকাশের কৃতিত্বও একজন জার্মান সংস্কৃতজ্ঞের প্রাপ্য। যাহা হউক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সামবেদ সম্পাদনের কার্যে সত্যব্রত সামশ্রমীকে উপযুক্ততম মনে করিয়া তাঁহাকে এই কার্যের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করেন। সত্যব্রত সানন্দে এই কার্যভার

গ্রহণ করেন। যতদিন বৃদ্ধ পিতা জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত সত্যব্রত স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করেন নাই, মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সত্যব্রত সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ইতিপূর্বে কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে এই কলেজে একটি অধ্যাপক-পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, সত্যব্রত এই পদ গ্রহণ করেন নাই, কারণ বঙ্গদেশে থাকিয়া বেদের অধ্যাপনা ও বেদপ্রচার শুধু তাঁহার নিজেরই অভীষ্ট ছিল না, তাঁহার পিতারও ইহা পরম অভিপ্রেত ছিল। কলিকাতায় আসিয়া বেদ প্রচারোদ্দেশ্যে সত্যব্রত একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন। অতঃপর "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সম্পাদিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তাঁহার সম্পাদিত ও অনূদিত সকল গ্রন্থই এই মুদ্রাযন্ত্র হইতেই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে থাকে। গ্রন্থ প্রচার ব্যতীত স্বগৃহে অন্নদান করিরা তিনি বহু ছাত্রকে বেদশিক্ষা দিতেন। জীবদ্দশাতেই সত্যব্রত অসাধারণ বেদজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ভারতের এবং বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী বেদসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য সর্বদাই সত্যব্রতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি সত্যব্রতকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বেদের অধ্যাপক (লেকচারার) ও পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা হইতে সত্যব্রত প্রত্নকম্রনন্দিনীর অনুরূপ "উষা" নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। এই অভিনব পত্রটিতে তাঁহার বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়, এই সব গ্রন্থের সহিত অধিকাংশ স্থানে মূলের সহিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট থাকিত। "উষা"র প্রবন্ধগুলির মধ্যে বৈদিকযুগ সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হইত। একটি প্রবন্ধে সত্যব্রত ইহাই প্রতিপাদিত করেন যে, বৈদিক আর্যেরা মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ও পৃথিবী কর্তৃক সূর্য প্রদক্ষিণ তথ্যটি

সবিশেষ অবগত ছিলেন। অন্য একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, বৈদিক মতে বাল্য বিবাহ গর্হিত, কন্যা রজঃস্বলা হওয়ার পরই তাহার বিবাহ বিধেয়। একটি প্রবন্ধে সত্যব্রত প্রমাণ করেন যে সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, অভক্ষ্য ভক্ষণই শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সত্যব্রতের সমসাময়িক কালে হিন্দু মহিলাদের পাদুকা ব্যবহার নিন্দিত ছিল। মহিলাদের জুতা পরিতে দেখিলে রক্ষণশীল হিন্দুরা "ব্রাহ্মিকা" বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ভ্রূকুটী করিতেন। উষার একটি প্রবন্ধে সত্যব্রত দেখাইয়াছিলেন যে, আর্যনারিগণ ছাতা ও জুতা দুই-ই ব্যবহার করিতেন বরং ইহা ব্যবহার না করাই দূষণীয় ছিল। স্ত্রীজাতির বেদপাঠের অধিকারও তিনি একটি প্রবন্ধে সমর্থন করেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সামশ্রমী সম্পাদিত সায়ণভাষ্যসহ সামবেদ পাঁচটি সুবৃহৎ খণ্ডে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে সামবেদ প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব সর্বতোভাবে সত্যব্রতেরই প্রাপ্য। এই গ্রন্থ মালার তৈত্তিরীয় সংহিতার ছয়টি খণ্ডের শেষ খণ্ডটি তাঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হয়, অপর খণ্ডগুলি ই. রোয়ার, ই. বি. কাউয়েল ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সম্পাদন করেন (১৮৫৪-৯৯)।

এতদ্ব্যতীত "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সায়ণভাষ্যসহ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (চারখণ্ড, ১৮৯৪-৯৬), সায়ণভাষ্যসহ শতপথ ব্রাহ্মণ (দুই খণ্ড, ১৮৯৯-১৯১২), ও যাস্কের নিরুক্ত (চারি খণ্ড, ১৮৯০-৯১) সম্পাদন করিয়া সামশ্রমী সমগ্র বেদানুরাগী সমাজের অশেষ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় দুইখণ্ডে হিন্দুশাস্ত্র নামে যে সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৮৯৫-৯৭) তাহার প্রথম খণ্ডের সঙ্কলন কার্যে সত্যব্রত সবিশেষ সহায়তা দান করেন, রমেশচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করেন। এই খণ্ডে বেদসংহিতা (১ম ভাগ), ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ (২য় ভাগ), শ্রৌত, গৃহ ও ধর্মসূত্র (৩য় ভাগ) মূল ও অনুবাদ সহ সন্নিবিষ্ট

হইয়াছিল। অনুবাদের অধিকাংশ অংশই ছিল সামশ্রমী কৃত। রমেশচন্দ্র অনূদিত অংশগুলিও সত্যব্রত সংশোধন করিয়া দেন, গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সত্যব্রত নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র হইতে বঙ্গাক্ষরে সভাষ্য সামবেদ, যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ ও অঙ্গগ্রন্থাদি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। বৈদিক গ্রন্থ ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। "কারণ্ডব্যূহ" নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও তিনি বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৭৩)। স্ব-উদ্যোগে প্রকাশিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে ও বহুস্থলে বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ আশৈশব বাঙ্গলার বাহিরে বাসকারী সত্যব্রতের অকৃত্রিম বঙ্গভাষানুরাগের নিদর্শন। সত্যব্রতের স্বীয় উদ্যোগে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার অনেকগুলি গ্রন্থ উষার অঙ্গীভূত ছিল—ন্যায়াবলি (সংস্কৃত সদুক্তি সংগ্রহ, কলিকাতা ১৮৭১), ত্রয়ী ভাষা (বৈদিক মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ, কলিকাতা ১৮৯৭), ত্রয়ী চতুষ্টয় (বেদ পাঠের ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সার সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৮৯২) ত্রয়ী টীকা (ঋক্, যজু ও সামবেদ সংগ্রহ, কলিকাতা ১৮৯৭), অক্ষর তন্ত্রম্ (কলিকাতা, ১৮৮৯), আপস্তম্বীয় যজ্ঞপরিভাষা সূত্রম্ (বঙ্গানুবাদসহ, কলিকাতা, ১৮৯১), আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (কলিকাতা, ১৮৭৪), মন্ত্রব্রাহ্মণম্ (ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত, বঙ্গানুবাদ ও টীকাসহ, কলিকাতা ১৮৭৩), সামবিধান ব্রাহ্মণম্ (বঙ্গানুবাদসহ, কলিকাতা, ১৮৯৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (কলিকাতা, ১৯০৩), বংশ ব্রাহ্মণম্ (বঙ্গানুবাদসহ, কলিকাতা, ১৮৯২), শুক্ল যজুর্বেদ : বাজসনেয়ি সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা (কলিকাতা, ১৮৭৪ শক), কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা (কলিকাতা ১৮৯৯), যজুর্বেদ সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা (কলিকাতা ১৮৭৭) সামপ্রতিশাখ্যম্ (সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভূমিকাসহ, কলিকাতা, ১৮৯০)

সামবেদ সংহিতা (সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ, কলিকাতা, ১৮৭৯), গোভিল গৃহ্যসূত্র (বঙ্গানুবাদসহ, কলিকাতা, ১৮৮৬), নিরুক্তালোচনম্ (যাস্কের নিরুক্ত ব্যাখ্যা, কলিকাতা, ১৯০৭), চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য রচিত মাধব চম্পূ কাব্যম্ ও বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিণী (কলিকাতা, ১৮৭১), জয়ন্তস্বামী রচিত খরাঙ্কুশঃ (কলিকাতা, ১৮৯৪), জিনদত্ত সূরী রচিত বিবেক বিলাসঃ (কলিকাতা, ১৮৭৬), মধুসূদন সরস্বতী রচিত অষ্টবিকৃতি বিবৃতি (কলিকাতা, ১৮৮৯), নারদীয় শিক্ষা (কলিকাতা, ১৮৯০), নিদান সূত্রম্ (কলিকাতা, ১৮৯৬), সাম প্রকাশনম্ (কলিকাতা, ১৮৯১), রাজশেখর কৃত বিদ্ধশালভঞ্জিকা (টীকা সহ, কলিকাতা, ১৮৭৩), চন্দ্রশেখর চম্পূঃ (কলিকাতা, ১৮৭১), উভট পার্ষদ সূত্রবৃত্তি (কলিকাতা, ১৮৯৫), (শাকল্য) পদ গাঢ়ঃ (কলিকাতা, ১৮৮৯), (শৌনক) পার্ষদ সূত্রম্ (কলিকাতা, ১৮৯৬), উপলেখ সূত্রম্ (কলিকাতা, ১৮৯৫), ষড়বিংশতি ব্রাহ্মণম্ (কলিকাতা, ১৮৭৪), উপগ্রন্থ সূত্রম্— (কলিকাতা, ১৮৯৭), উপনিষদঃ (কলিকাতা, ১৮৯৫), পার্ষদ সূত্রবৃত্তিঃ (কলিকাতা, ১৯০৫), সামপদ সংহিতা (কলিকাতা, ১৮৯১), অগ্নিস্তোম সামানি (কলিকাতা, ১৮৯২), সপ্তদশ মহাসামানি (কলিকাতা, ১৮৯১), দেবতাতত্ত্বঃ বাঙ্গলায় বেদোল্লিখিত দেবতাগণের আলোচনা (মাহেশ, ১৮৭৩) ইত্যাদি।

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের রক্ষিত পুস্তক তালিকায় সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিরও উল্লেখ আছে, এগুলির রচনাকাল তালিকাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই:—বহু বিবাহ বিচার সমালোচনা, পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-ভাষ্যসার, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ভাষ্য, গোভিলগৃহ্যসূত্র ব্যাখ্যান, মীমাংসা সূত্র ভাষ্য ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রাহ্মধর্মের টীকা।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন বেদপ্রচারক সত্যব্রত গুরুপরিশ্রম জনিত সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিনপুত্র ও এক ভ্রাতা জীবিত ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় ও অক্লান্ত বেদপ্রচারক পণ্ডিতরূপে সত্যব্রত সামশ্রমীর নাম চিরস্মরণীয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত

(১৮৪৮—১৯০৯)

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট কলিকাতার রামবাগান পল্লীর সুপ্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় সরকারের অধীনে ডেপুটি কালেক্টরের চাকুরি করিতেন। বাল্যকালে রমেশচন্দ্র পিতার সহিত বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইহাতে রমেশের ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশের শিক্ষার ব্যাঘাত হইতে থাকায় তাঁহাদের পিতা তদীয় অনুজ তদানীন্তনকালের সুবিখ্যাত ইংরাজী-লেখক শশীচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় রাখিয়া তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। রমেশচন্দ্র পিতার মধ্যমপুত্র ছিলেন। তাঁহার অনুজের নাম ছিল অবিনাশ।

রমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলে (পরে ইহার নাম হয় হেয়ার স্কুল) প্রবিষ্ট হন। রমেশচন্দ্রের বয়স যখন তের বৎসর তখন তিনি পিতৃহীন হন, ইহার দুই বৎসর পূর্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র জুনিয়ার গ্রেড বৃত্তিসহ এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজ হইতে সিনিয়র গ্রেড বৃত্তিসহ এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করার সময় রমেশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে গিয়া ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতামহ পীতাম্বর দত্ত জীবিত ছিলেন। রক্ষণশীল পিতামহ ও পরিবারের অন্যান্য পরিজনবর্গ সমুদ্র যাত্রায় সম্মতি দিবেন না আশঙ্কা করিয়া রমেশচন্দ্র

গোপনে দেশত্যাগ করার সঙ্কল্প করেন। রমেশচন্দ্রের এই বিদেশ যাত্রায় অগ্রজ যোগেশচন্দ্রের সম্মতি ছিল, তিনি গোপনে অর্থ-সংগ্রহাদি করিয়া ভ্রাতার উচ্চাভিলাষ পূরণে সহায়তা করেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রমেশচন্দ্র গোপনে তাঁহার অপর দুইজন বন্ধু ও সহাধ্যায়ী বিহারীলাল গুপ্ত ও পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দেশত্যাগ করেন।

লণ্ডন পৌঁছিয়া রমেশচন্দ্র আই. সি. এস. পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই কলেজে রমেশচন্দ্র অধ্যাপক হেনরী মর্লির নিকট ইংরাজী সাহিত্য ও সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ থিয়োডোর গোল্ডস্ট্যুকরের (১৮২১-১৮৭২) নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালেই রমেশচন্দ্র একাগ্রতা সহকারে সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিন বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রমের পর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র ৪৮ জন নির্বাচিত ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া শিক্ষানবিসী সহ আই-সি-এসের অন্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষিত হন। বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তিনি তিনটি বিশেষ পারিতোষিকও লাভ করেন। এই বৎসর আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থানের অধিকারী হন উত্তরকালের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট আর্থার স্মিথ (১৮৪৮-১৯২০)। রমেশচন্দ্রের সহযাত্রী অপর দুই বন্ধু বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথও যথাক্রমে ১৪শ ও ৩৮তম স্থান অধিকার করিয়া এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হন।

এই বৎসরেই ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রমেশচন্দ্র সেপ্টেম্বর মাসে বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্তর রমেশচন্দ্র প্রায় দশবর্ষকাল বাঙ্গলার

বিভিন্ন জেলার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টারের পদে কার্য করেন। ইহার পর প্রায় বার বৎসরকাল বিভিন্ন স্থানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করার পর তাঁহাকে বর্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। বাঙ্গালীদের এমন কি ভারতীয়দের মধ্যে রমেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই উচ্চপদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র উড়িষ্যার বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। প্রায় দুই বৎসর কাল এই পদে কার্য করার পর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রমেশচন্দ্র ছুটি লইয়া ইংল্যাণ্ড গমন করেন। অবকাশকাল শেষ হইলে তিনি আর রাজকার্যে যোগদান করেন নাই, বাৎসরিক একসহস্র পাউণ্ড পেন্সন সহ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্র ইতিপূর্বেই সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতবিদ্যা চর্চায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

সিভিল সার্ভিসের কর্মীরূপে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবাই রমেশচন্দ্রের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল, তিনি যখন যে স্থানেই সরকারী কর্মচারীরূপে অধিষ্ঠিত থাকিতেন সেইখানেই তিনি জনসাধারণের দুঃখ মোচনে ও ন্যায় বিচার সাধনে তৎপর হইতেন। প্রজাদের স্বার্থ যাহাতে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয় এদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার শাসিত জেলায় শিক্ষা বিস্তার ও অন্যান্য জনহিতকর কার্যেও তিনি অগ্রণী হইতেন। দক্ষ-প্রশাসক হিসাবে রমেশচন্দ্র সাতিশয় খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতের পর তাঁহার চেষ্টায় ও গভর্নমেণ্টের অনুমতিক্রমে (অবিভক্ত) বঙ্গের বরিশাল জেলাটি পুনর্গঠিত হয়। তিনি যে সব সদর বা জেলার ভারপ্রাপ্ত শাসক থাকিতেন সেখানে তাঁহার সুশাসনের গুণে দুষ্কৃতির সংখ্যা আশাতীতরূপে হ্রাস পাইত। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। সরকার মনোনীত সদস্যরূপেও ব্যবস্থাপক সভায় তিনি সর্বদাই প্রজাকল্যাণমূলক কর্মধারার অনুসরণ করিতেন।

এই সময়ে রাষ্ট্রনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু মহাশয়দ্বয়ও এই ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। সরকারী সদস্য রমেশচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা তাঁহাদের দেশবাসীর হিতসাধনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী হইত। প্রশাসকরূপে রমেশচন্দ্রের অসাধারণ দক্ষতা ভারতের গভর্নর জেনারেলেরও মনোযোগ এবং প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল।

সরকারী চাকুরিতে যোগদানের পর রমেশচন্দ্র বাঙ্গলার পল্লী-গ্রামের দুরবস্থার কথা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পান। কৃষকদের অবস্থা ও ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে চাকুরি জীবনের প্রথম যুগে তিনি ছদ্মনামে ইংরাজীতে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র রচিত "দি পেজ্যান্ট্রি অফ বেঙ্গল" পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনকালে বাঙ্গালী প্রজাগণের দুরবস্থার কথা বর্ণিত আছে। এই দুরবস্থার প্রতিকারার্থে রমেশচন্দ্র নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। সরকারী কর্মচারীরূপে সাহিত্য-সাধনা অথবা স্বদেশের হিতচিন্তা করা যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভব হইবে না চিন্তা করিয়াই সম্ভবতঃ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে যান এবং অবকাশান্তে নির্দিষ্ট সময়ের নয় বৎসর পূর্বেই সরকারী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ শক্তিশালী হইতেছিল; রমেশচন্দ্র রাজকর্মচারী থাকা অবস্থাতেই ইহার কোন কোন প্রস্তাব প্রকাশ্য ভাবেই সমর্থন করেন। দশ মাসের অবকাশকালে এবং অবসর গ্রহণান্তে দীর্ঘদিন তিনি ইংল্যাণ্ডে থাকিয়া ইংরাজ জনসাধারণের মধ্যে ও পার্লামেণ্টে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড বাসকালে রমেশচন্দ্র তিন বৎসরের জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদটি ছিল অবৈতনিক পদ, তবে ইহা সম্পূর্ণ

আয়হীন ছিল না, কোন কোন বক্তৃতার জন্য প্রবেশ দক্ষিণাও বক্তার প্রাপ্য হইত। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের কার্য গ্রহণ করিলেও রমেশচন্দ্রের প্রচুর অবসর মিলিত ; এই অবসরকাল রমেশচন্দ্র ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যয় করিতেন। রমেশচন্দ্রের কোন কোন সমালোচনা ও পরামর্শ বিশেষতঃ ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ভূমি রাজস্বের হার হ্রাস ইত্যাদি প্রস্তাব ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ও অনুসৃত হইয়াছিল। ভারতের স্বার্থের অনুকূলে ইংল্যাণ্ডে জনমত গঠনে রমেশচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রয়াস তাঁহার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। একমাত্র ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই রমেশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ভারতে রাজদ্রোহ আইন, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনতা হরণ ও ভারত সরকারের সীমান্ত নীতির সমালোচনা করিয়া প্রায় চব্বিশটি জনসভায় ভাষণ দান করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া স্বদেশে আসেন এবং ২৯শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় ভারতে ইংরাজ শাসনের ত্রুটিগুলি উদ্‌ঘাটন করিয়া রমেশচন্দ্র বলেন যে—ইংরাজ সরকারের উচিত এই জাতীয় মহাসভার মতামতগুলি ভারতের জনসাধারণের মতামত বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং তদনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা ; ইংরাজ কর্মচারীদের পরামর্শগুলি একদেশদর্শী ও তাহা জনমতের অভিব্যক্তি নহে। অধিবেশন শেষে রমেশচন্দ্র জন্মভূমি কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে দুইটি জনসভায় বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। কয়েক মাস স্বদেশে বাস করিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রমেশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান। ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া তিনি ভারতে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন করিতে থাকেন। এই বৎসরই তাঁহার লিখিত "ফেমিনস্ ইন ইণ্ডিয়া" পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। ভারতে দুর্ভিক্ষের

কারণ ও প্রজার উপর ভূমি রাজস্বের গুরুভার সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি পত্র লেখেন, এইগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (Open letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessment in India—London, 1900)। ১৮৯৭ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রমেশচন্দ্রের রাজনীতিক চিন্তাধারার পরিচয় তাঁহার Speeches and Papers on Indian Question. (Calcutta, 1902) নামক রচনা-সংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া যায়।

সরকারী প্রশাসকরূপে জনগণের জীবনযাত্রার সহিত রমেশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া রমেশচন্দ্র ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে রমেশচন্দ্র ব্রিটিশ শাসনের সূচনাকাল হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড "ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া" (১৭৫৭-১৮৩৭) নামে লণ্ডন হইতে দুইভাগে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড "ইণ্ডিয়া ইন্ দি ভিক্টোরিয়ান এজ (১৮৩৭-১৯০০)" নামে লণ্ডন হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক রচনাবলী সমূহের প্রতিপাদ্য এই ছিল যে ভারতে বৃটিশ শাসনকালে অন্যান্য শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর অধিকার সঙ্কুচিত হওয়ায় দেশের আশি শতাংশ সংখ্যক ব্যক্তিই কৃষি-নির্ভর হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই কৃষি ব্যবস্থাও অনুন্নত এবং ভূমি রাজস্বের পরিমাণ অত্যধিক, এই জন্যই ভারতীয় কৃষকদের অপরিসীম দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয়, শুধু তাহাই নহে আজীবন তাহাদের ঋণভারে প্রপীড়িত থাকিতে হয়। প্রজারা যে পরিমাণ রাজস্ব দেয় তাহার বিনিময়ে তাহারা সরকারের নিকট হইতে প্রায় কিছুই উপকার পায় না। এই পুস্তকে উত্থাপিত যুক্তি ও তথ্যগুলি ইংল্যাণ্ডের বহু উদারপন্থী

রাজনীতিজ্ঞ ও রাজনৈতিক কর্মীদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। বৃটিশ-শাসন যে শোষণেরই নামান্তর এই তথ্যটি ভারতে ও ইংরাজের স্বদেশে তুলিয়া ধরা রমেশচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। রমেশচন্দ্রের এই অর্থনৈতিক ইতিহাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান মিরর্ পত্রের তৎকালীন সম্পাদক এন. এন. ঘোষ লিখিয়াছিলেন—এইরূপ একটি গ্রন্থে দেশের যে কল্যাণ হয়, কংগ্রেসের ঝুড়ি বোঝাই বক্তৃতায় তাহা হয় না ("A book like this does more work than cart-load of Congress speeches")।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রমেশচন্দ্র স্বদেশে আসিয়া আবার পরের বৎসর এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান। এইবার তিনি দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচনাকালে এই অভিজ্ঞতা বিশেষ সহায়ক হয়। রমেশচন্দ্রের ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাকে সরকারী পুলিস কমিশনে সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করা হয়। কর্মজীবনে রমেশচন্দ্র বহুবার পুলিস বিভাগের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। এই কমিশনের নিকট রমেশচন্দ্র বলেন যে পুলিস বিভাগে বেতন কম এইজন্য এই বিভাগে গুরুদায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়। অন্যায় করিলেও ইহাদের শাস্তি দেওয়া হয় না, ইহাদিগকে যে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অনুচিত।

রমেশচন্দ্রের বিদ্যাবত্তা, কর্মদক্ষতা ও দেশহিতৈষণায় আকৃষ্ট হইয়া বরোদার উদারপন্থী ও মহানুভব মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়াড় রমেশচন্দ্রকে স্বরাজ্যে রাজস্বমন্ত্রীর পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। দেশবাসীর সেবা করার সুযোগ লাভ করিয়া রমেশচন্দ্র ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে বরোদার রাজকার্যে যোগদান করেন। তাঁহার সুশাসনে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বরোদা রাজ্যের

প্রভূত উন্নতি হয়। তাঁহারই চেষ্টায় এই রাজ্যে স্থানীয়-স্বায়ত্ব-শাসন প্রবর্তন, রাজস্ব নীতির সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার এবং ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়। (দ্রষ্টব্য : রমেশচন্দ্র রচিত Baroda Administration Report 1902-3, 1903-4, 1905-7)।

বরোদার অমাত্য থাকার সময়ে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রমেশচন্দ্র কাশীতে অনুষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স" বা ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের সভাপতির আসনে বৃত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পবস্তু ব্যবহারের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সম্মেলনেও রমেশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিন বৎসর ধরিয়া বরোদার অমাত্যের পদে কার্য করার পর ভারত গভর্নমেণ্ট রমেশচন্দ্রকে রাজকীয় বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করেন। সরকারী শাসন-ব্যবস্থা সংস্কার ও ইহার উন্নতি সম্পর্কিত পরামর্শ দানের জন্যই এই সরকারী কমিশনের সৃষ্টি হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই কমিশনের কার্য চলিয়াছিল। এ দেশের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ শেষ হইলে সদস্যগণ ইংল্যাণ্ডে গিয়া বাকী কার্যটুকু শেষ করেন। এই সময় রমেশচন্দ্রও কমিশনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। রমেশচন্দ্রের চেষ্টায় এই কমিশন গভর্নমেণ্টকে শাসন সংস্কার বিষয়ে উদার ও বাস্তব নীতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শগুলি পরবর্তী সময়ে মিণ্টো-মর্লি শাসন সংস্কার প্রবর্তনকালে বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে আসিয়া রমেশচন্দ্র শুধু কমিশনের কাজেই লিপ্ত ছিলেন না, ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কেও নানাস্থানে তিনি বক্তৃতা দান করেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্বে বরোদা হইতে ছুটি লইয়া কয়েক মাসের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন। এই সময় মহামতি গোখলেও এদেশে ছিলেন,

এবারও গোখলের সহিত একযোগে তিনি নানাস্থানে ভারতের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দেন ও ভারতের স্বার্থের অনুকূলে জনমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। রাজকীয় বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের কার্যকাল অন্তে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রমেশচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে বরোদার দেওয়ানের (প্রধান অমাত্য) মৃত্যু হইলে সয়াজী রাও-এর বিশেষ অনুরোধে ১লা জুন তারিখে মাসিক চারিহাজার টাকা বেতনে রমেশচন্দ্র বরোদার প্রধান অমাত্যের পদে যোগদান করেন। ইহার কিছুদিন পর রমেশচন্দ্রের অনুরোধে সয়াজী রাও তাঁহার আবাল্যসুহৃদ অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তকে রাজ্যের প্রধান আইন-উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত করেন। দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু স্থির করেন যে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহারা অবসর লইয়া বাংলাদেশে অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিবেন। অবসর গ্রহণ করিয়া বাংলাদেশে বাস করার সুযোগ রমেশচন্দ্র পান নাই। স্বল্পকাল রোগ ভোগের পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর রমেশচন্দ্র বরোদার প্রধানমন্ত্রীরূপেই দেহত্যাগ করেন। রমেশচন্দ্র চিরদিন ভারতীয় ঐক্যের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বরোদার হিন্দু, মুসলমান ও পার্শী সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই শোকবিহ্বল হন। বরোদার জনসাধারণের নিকট রমেশচন্দ্র দরিদ্রের বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন (গরীব কা দোস্ত্)।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে বরোদার রাজপরিবারের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত শ্মশান ভূমিতে রমেশচন্দ্রের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। বরোদায় রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বঙ্গদেশে গভীর শোকের সঞ্চার হয়। ইংল্যাণ্ডেও রমেশচন্দ্রের বহু বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলেই রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকাকুল হন।

রমেশচন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন ষোড়শবর্ষ মাত্র তখন তাঁহার বিবাহ

হয়। মৃত্যুকালে রমেশচন্দ্র বিধবা পত্নী, চারি কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া যান। রমেশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অজয়চন্দ্র আইনের নিপুণ অধ্যাপকরূপে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা প্রমথনাথ বসু (কমলা দেবীর স্বামী) একজন প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সরলার সহিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই-সি-এসের বিবাহ হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ইংরাজী ভাষায় রমেশচন্দ্রের একখানি অতি উত্তম জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ("লাইফ এণ্ড ওয়ার্ক অফ্ রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৯১১)। রমেশ-চন্দ্রের জীবনীপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "রমেশচন্দ্র দত্ত" নামীয় তথ্যবহুল পুস্তিকাটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, নং ৬৫)।

রমেশচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ পরিচয় একজন স্বদেশ প্রেমিক রাজনীতিজ্ঞ ও কর্মীরূপে, তাঁহার দ্বিতীয় পরিচয় বঙ্গ ভারতীর একজন একনিষ্ঠ সেবক তথা বরেণ্য কথাশিল্পীরূপে এবং তাঁহার তৃতীয় পরিচয় একজন সুপণ্ডিত ভারত-বিদ্যা সাধকরূপে। রমেশচন্দ্রের এই ত্রিমুখী সাধনার প্রথম দিকের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল এবার তাঁহার বঙ্গসাহিত্য সাধনার কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করার পর রমেশচন্দ্র "আরসিডি" (আর-সি-ডি) এই ছদ্মনামে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগাজিন" ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মুখার্জি'স ম্যাগাজিন"-এ ইংরাজীতে প্রবন্ধ ও কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের পিতার পরিচিত বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশে রমেশচন্দ্র বাঙ্গলা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইতিহাস-শাস্ত্রে রমেশচন্দ্রের প্রগাঢ় দক্ষতা ছিল। এই ইতিহাস জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া প্রকাশ করেন—বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবী কঙ্কন (১৮৭৭),

জীবন প্রভাত (১৮৭৮), ও জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯)। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকাশ-কাল হইতে এ যাবৎ বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ও বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে।

চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পর রমেশচন্দ্র দুইখানি সার্থক সামাজিক উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ করেন। ইহাদের নাম সংসার (১৮৮৬), এবং সমাজ (১৮৯৪)। ঔপন্যাসিক হিসাবে রমেশচন্দ্রের রচনার মূল্য সম্বন্ধে এ কালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "...রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুই প্রকার উপন্যাসেই নিজ ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহার 'জীবন প্রভাত' ও 'জীবন সন্ধ্যা' বঙ্গ সাহিত্যে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেকগুলি গুণ আছে—তিনি বর্ণিত যুগের বিশেষত্বটুকু উপলব্ধি করেন, বীরত্ব কাহিনীর উন্মাদনা নিজ রক্তের মধ্যে অনুভব করেন ও বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন।... সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণ তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পল্লীগ্রামের দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৫০-৫১, তৃতীয় সং, ১৯৫৬)।

রমেশচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস গ্রন্থাবলী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া কিছু দিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে (রমেশ রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৬৩)।

রমেশচন্দ্র সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্য কত অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও তাঁহার রসবোধ কত গভীর ছিল তাঁহার

লিখিত "দি লিটারেচর অফ বেঙ্গল" (১৮৭৭) নামক পুস্তকটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতক পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অপূর্ব দক্ষতার সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১২৯২ হইতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রমেশচন্দ্রের অনেকগুলি বাঙ্গলা রচনা নবজীবন, নব্যভারত, ভাণ্ডার, ভারতী, ভারতী ও বালক, মুকুল, সাধনা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের দানের আলোচনা করিয়া ভারতবিদ্যা-সাধকরূপে অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁহার সাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। কৈশোরকালেই রমেশচন্দ্র উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। যৌবনকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীরূপে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডঃ থিওডোর গোল্ডষ্ট্যুকারের নিকটও সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন পূর্বেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াও তিনি সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্য প্রতিভার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্‌বেদ। শুধু তাহাই নহে এ পর্যন্ত ঋগ্‌বেদই সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া সাধারণভাবে স্বীকৃত। ইংল্যাণ্ড প্রবাসী জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স মুল্লার (১৮২৩-১৯০০) ১৮৪৯ হইতে ১৮৭৪ পর্যন্ত সায়নভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্‌বেদের মূল গ্রন্থ ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন, ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পূর্বে ও কিছু পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহার আংশিক বা পূর্ণ অনুবাদ ল্যাটিন, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান প্রভৃতি ভাষায় সম্পন্ন করেন। ম্যাক্স মুল্লারের ঋগ্‌বেদ প্রকাশের পর রমেশচন্দ্র ইহার বাঙ্গালা অনুবাদকার্যে ব্রতী হন, এবং দুই বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ

করেন[১]। রমেশচন্দ্র এই অনুবাদকার্যে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ ও উৎসাহ লাভ করেন। ইতিপূর্বে বাঙ্গলা ভাষায় এমন কি কোন ভারতীয় ভাষায় কেহই ঋগ্‌বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্রের এই ঋগ্‌বেদ অনুবাদ ও প্রকাশ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন "রমেশচন্দ্রের এই কীর্তিটি চিরস্থায়ী হইবে।—বাঙ্গালী ইহার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না।"

১৮৮০-৯০ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ইংরাজী ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস ৩টি খণ্ডে রচনা করিয়া প্রকাশ করেন[২]। এই পুস্তকটি ম্যাক্স মুল্লার, ভেবর, ইয়োলি, উইনট্যর্‌নিৎজ, পিশেল, বার্থ, কার্ন, ওল্ডেনবুর্গ প্রভৃতি ইংরাজ, জার্মান, ফরাসী ও ডাচ্‌ সংস্কৃতজ্ঞগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে এই পুস্তকখানির সংশোধিত সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই বৎসর এই পুস্তকটির একটি ছাত্রপাঠ্য সংস্করণও প্রকাশিত হয়[৩]।

যৌবনকাল হইতে রমেশচন্দ্র ইংরাজী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত লিখিত ভারতীয় সাহিত্যের নির্বাচিত কতকগুলি অংশ তিনি ইংরাজীতে পদ্যাকারে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশ করেন[৪]। ইহার পর

১। ঋগ্‌বেদ সংহিতা (মূল)—১৮৮৫, কলিকাতা; (ঐ) বঙ্গানুবাদ—১৮৮৫-১৮৮৭, কলিকাতা (২য় সংস্করণ—কলিকাতা, ১৯০৯, ৩য় সংস্করণ জ্ঞান-ভারতী, কলিকাতা, ১৯৬৩)।

২। A history of civilization in ancient India based on Sanskrit literature, Vols 1-3, 1889—90, Calcutta; Revised Edition in 2 Vols, London, 1893.

৩। Ancient India, London, 1893.

৪। Lays of Ancient India, London, 1894.

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহাভারতের সংক্ষেপিত উপাখ্যান-ভাগ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক ম্যাক্স মুল্লার ইহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। পরের বৎসর রামায়ণের সংক্ষিপ্ত আখ্যানটিও তিনি ইংরাজীতে প্রকাশ করেন[৫-৬]। এই শেষোক্ত পুস্তক দুইটি পরে "এভরিম্যানস্ লাইব্রেরী" নামীয় সুবিখ্যাত গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে (নং—৪০৩, লণ্ডন, ১৯৫৩)।

রমেশচন্দ্র শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন না, সংস্কারবাদী ও আধুনিক মতাবলম্বী হইলেও আর্য-ঋষি প্রচারিত প্রাচীন হিন্দুধর্মে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। হিন্দুশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি "হিন্দুশাস্ত্র" নামে এক গ্রন্থমালা প্রবর্তন করেন। রমেশচন্দ্র এই গ্রন্থমালার দুইটি খণ্ড ৯ ভাগে মূল ও অনুবাদসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন[৭]। এই গ্রন্থমালা সঙ্কলনের কার্যে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার সহায়তা করেন। এই শাস্ত্রমালার মধ্যে ঋগ্‌বেদ সংহিতা (১ম ভাগ) ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ (২য় ভাগ), শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র (৩য় ভাগ) স্বয়ং রমেশচন্দ্র কর্তৃক অনূদিত

৫। Mahabharat—condensed into Eng. verse, London, 1899.

৬। Ramayan—condensed into Eng. verse London, 1900.

৭। হিন্দুশাস্ত্র (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ১৮৯৩ ৯৭ ; ১ম ভাগ—বেদ-সংহিতা—সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত। ২য় ভাগ—ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্—সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত। ৩য় ভাগ—শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র—সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত। ৪র্থ ভাগ—ধর্মশাস্ত্র—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। ৫ম ভাগ—ষড়দর্শন—কালীবর বেদান্তবাগীশ ; হিন্দুশাস্ত্র (দ্বিতীয় খণ্ড) ৬ষ্ঠ ভাগ—রামায়ণ—হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ৭ম ভাগ—মহাভারত—দামোদর বিদ্যানন্দ। ৮ম ভাগ—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দামোদর বিদ্যানন্দ। ৯ম ভাগ—অষ্টাদশ পুরাণ—আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী।

হয়। "হিন্দুশাস্ত্র" প্রচারেও রমেশচন্দ্রের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন "বন্দেমাতরম" মন্ত্রস্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

১২৯২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা হইতে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত ঋগ্‌বেদের দেবগণ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের ৭টি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ "নবজীবন" পত্রে প্রকাশিত হয় (দ্রষ্টব্য—রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রবন্ধ সঙ্কলন, নিখিল সেন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫৯)।

সুপ্রসিদ্ধ ভারতী পত্রিকায় হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮)। কালিদাস ও ভবভূতি রমেশচন্দ্রের প্রিয় কবি ছিলেন, ইঁহাদের সম্বন্ধে দুইটি আলোচনা যথাক্রমে ভারতী ও বালক (পৌষ, ১২৯৯) এবং সাধনা (মাঘ, ১২৯৯) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল (দ্রষ্টব্য—তদেব)। সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় সন্নিবিষ্ট (১৯০২ সং) রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল ও রমেশ মিত্রের জীবনীগুলি রমেশচন্দ্র কর্তৃক লিখিত হয়।

এতদ্‌ব্যতীত রমেশচন্দ্র রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নামও উল্লেখযোগ্য :—

Three Years in Europe (পত্রাবলীর সঙ্কলন)—Calcutta, 1872; Rambles in India, 1871-1895, Calcutta 1895; Reminiscence of a Workman's Life (poems), Calcutta 1896; England and India (1785-1885), London, 1897; The Lake of Palms—London, 1902; Indian Poetry Selections rendered into English Verse, London, 1905; The Slave Girl of Agra—London, 1909; A Brief History of Ancient and Modern India (for schools), Calcutta, 1891; A Brief History of Ancient and Modern

Bengal (for schools), Calcutta, 1892 ; ভারতবর্ষের ইতিহাস (ছাত্র পাঠ্য)—কলিকাতা, নভেম্বর ১৮৭৯।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত রমেশচন্দ্রের প্রথমাবধিই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৩০১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯৪, এপ্রিল "বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটরেচর" "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্"-রূপে জন্মলাভ করিলে রমেশচন্দ্র উহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রায় দুই বৎসর কাল সভাপতি থাকিয়া তিনিই এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সুস্পষ্ট রূপদানে সহায়তা করেন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত করেন। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রমেশচন্দ্র আর একবার এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে রমেশচন্দ্র তাঁহার অমূল্য গ্রন্থভাণ্ডার (সংস্কৃত) পরিষৎকে দান করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল রয়াল কমিশনের কার্যশেষে রমেশচন্দ্র যখন স্বল্পকালের জন্য বাঙ্গলাদেশে আসেন তখন পরিষদের নবনির্মিত ভবনে তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে পরিষদ্-সংলগ্নভূমিতে "রমেশ-ভবন" নামে একটি দ্বিতল স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার সহিত রমেশচন্দ্রের সম্পর্ক পিতা পুত্রীর ন্যায় ছিল। নিবেদিতা রমেশচন্দ্রকে ধর্ম-পিতা (গড্ ফাদার) নামে অভিহিত করিতেন। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর নিবেদিতা "মডার্ন-রিভিউ" পত্রিকায় (জানুয়ারি, ১৯১০) তাঁহার জীবনাদর্শের কথা অতি সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেন। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পর্কে তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ ও স্নেহভাজন রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত অভিমতও উল্লেখযোগ্য, এই কয়ছত্রে রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে :

"তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি

তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশ হিতে, সর্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণ বেগে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছেন—বস্তুতঃ ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি—এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাঁহার কর্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদা প্রসন্ন অরুগ্ন নির্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।”

(১৬ই পৌষ ১৩১৬)

শরচ্চন্দ্র দাশ
(১৮৪৯—১৯১৭)

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই (২রা শ্রাবণ, ১২৫৫ বঙ্গাব্দ) চট্টগ্রাম শহরে শরচ্চন্দ্র দাশের জন্ম হয়। শরচ্চন্দ্রের পিতা দীনদয়াল ওরফে মাগন দাশ চট্টগ্রাম কালেক্টরী আপিসে কর্ম করিতেন। এই পরিবারের বাসস্থান ছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত চক্রশালা পরগণার আলামপুর গ্রাম। মোগল-শাসন কালে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল হইতে এই বৈদ্য পরিবার চট্টগ্রামে গিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। শরচ্চন্দ্রের পিতামহ ত্রিপুরা রাজসরকারের কর্মচারী ছিলেন। ইনি একজন অতিশয় ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। ইনি পদব্রজে কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্রের পিতা মাগন দাশও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি স্বীয় বাসগৃহের নিকট "ক্রমদীশ্বর" নামে একটি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গ্রামস্থ পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া শরচ্চন্দ্র চট্টগ্রাম স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর এল-এ. (লোয়ার আর্টস) পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ত বিভাগে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি পূর্তশিক্ষা কলেজ (সিভিল ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত এই পূর্ত বিভাগের বিলোপ সাধন করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে পূর্ত বিভাগে অধ্যয়নকালে শরচ্চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ স্যার আলফ্রেড্ ক্রফ্ট-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র যখন পূর্ত বিভাগের অন্তিম শ্রেণীর ছাত্র তখন সিকিমের সম্ভ্রান্ত বংশীয়

বালকদের ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য বাঙ্গলার তদানীন্তন লেপ্‌ট্‌ন্যান্ট গভর্নর সার জর্জ ক্যাম্পবেল দার্জিলিং শহরে 'ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে শরচ্চন্দ্র স্বাস্থ্যলাভার্থ দার্জিলিং-এ বাস করিতেছিলেন। হিতৈষী অধ্যাপক আলফ্রেড্ ক্রফ্‌টের অনুরোধে শরচ্চন্দ্র এই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের পর শরচ্চন্দ্র অতি যত্নসহকারে তিব্বতীয় ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। সুদূর অতীতে ভারতীয় পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তিব্বতে গিয়া কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার ও প্রচার করেন তাহার বিবরণ সর্বপ্রথম তিব্বতীয় গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়া তিব্বত ভ্রমণের জন্য শরচ্চন্দ্রের মনে প্রবল আগ্রহ জাগরিত হয়। ভুটিয়া আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে শরচ্চন্দ্র সিকিমের মহারাজা ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন। ইঁহারা শরচ্চন্দ্রের তিব্বতীয়, পালি ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান এবং বৌদ্ধ-ধর্মানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শরচ্চন্দ্রের অধীনে তাঁহার বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন উগায়েন গিয়াৎসু (Ugyen Gyatso) নামে একজন সিকিমবাসী লামা। এই তিব্বত-বংশীয় লামা ভুটিয়া বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে সিকিমের পেমাইয়াংসি মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মঠের পক্ষ হইতে ধর্মীয় ব্যাপারে উগায়েন গিয়াৎসু তিব্বতে পাঞ্চেন লামার রাজধানী তাসিলুনপো ও লাসায় প্রেরিত হন। শরচ্চন্দ্র যে তিব্বত ভ্রমণে অত্যন্ত আগ্রহী উগায়েন গিয়াৎসুর ইহা অজ্ঞাত ছিল না। উগায়েন গিয়াৎসুর নিকট শরচ্চন্দ্রের সংস্কৃতজ্ঞান, বৌদ্ধ ধর্মানুরাগ এবং তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রীতির কথা জানিতে পারিয়া পাঞ্চেন লামার প্রধানমন্ত্রী ও গুরু সেঙ্গ্‌ছেন দর্জিছেন (Sengchen Darjechan) শরচ্চন্দ্রের তিব্বত ভ্রমণের 'ছাড়পত্র' মঞ্জুর করাইয়া দেন। এই সময় তিব্বতে কোন বিদেশীর প্রবেশ

নিষেধ ছিল, বিদেশী মাত্রকেই গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভ্রমণকারীর প্রাণ-বধ করা হইত। এদিকে ইংরাজ সরকারও কোন বৃটিশ প্রজাকে তিব্বত যাত্রার অনুমতি দিতেন না। যাহা হউক উভয় দিক হইতেই তিব্বত ভ্রমণের অনুমতি সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে শরচ্চন্দ্র উগায়েন গিয়াৎসু সহ পদব্রজে তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই ভ্রমণকালে শরচ্চন্দ্র একটি ক্যামেরা, দিগ্‌দর্শনযন্ত্র, দূরবীক্ষণ ও তাপমাপক এবং পরিমাপক যন্ত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি জরিপ (সার্ভে) সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই অভিজ্ঞতা তিব্বত ভ্রমণ কালে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

সিকিমের জঙ্গরি নামক স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া শরচ্চন্দ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করতঃ নেপাল রাজ্যের ইয়ামপাঠশাল নামক স্থানে আসেন। এই স্থান হইতে তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিমপার্শ্বস্থ গিরিসঙ্কট ধরিয়া তাসিচোডিং নামক স্থানে পৌঁছেন। তাসিচোডিং হইতে তিব্বত সীমান্তের চাংথালা গিরিপথ দিয়া তিনি জেমু্‌ নদীর অববাহিকায় উপনীত হন এবং এই স্থান হইতে তিব্বতের তাসিলুনপো মঠে উপস্থিত হন। ছয়-মাসকাল এই মঠের ছাত্ররূপে শরচ্চন্দ্র বহু দুর্লভ বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব-অধীত তিব্বতীয় ভাষা-জ্ঞান বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। তিব্বতে অবস্থান কালে পাঞ্চেন লামার প্রধান মন্ত্রী শরচ্চন্দ্রের বিদ্যাবত্তা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ছয় মাস পর প্রত্যাবর্তন কালে শরচ্চন্দ্র তিব্বত হইতে বহু পুঁথি, পট প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া আসেন। তিব্বত ভ্রমণ ও যাত্রাপথের বিবরণ সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া যে পুস্তক রচনা করেন, বেঙ্গল্‌ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলা সরকারের তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তা স্যার

আলফ্রেড্ ক্রফ্ট স্বয়ং এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দেন।[১] এই পুস্তকটিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গের উত্তর ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের যে ভূবৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট আছে তাহা এখনও অতিশয় মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। পাঞ্চেন লামার প্রধানমন্ত্রী গুরু সেঙ্গ্ছেন দর্জিছেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন। শরচ্চন্দ্রের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় প্রকার বিদ্যাবত্তার দ্বারা তাঁহার ও তিব্বতবাসীর উপকার হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি শরচ্চন্দ্রকে পুনরায় তিব্বত ভ্রমণের আমন্ত্রণ পাঠান। এই আমন্ত্রণ পাইয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র পুনরায় তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিব্বত সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ভৌগোলিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ ও বৌদ্ধগ্রন্থাদি উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে শরচ্চন্দ্রের চেষ্টায় প্রীত হইয়া বেঙ্গল গভর্নমেণ্টও তাঁহাকে দ্বিতীয়বার তিব্বত যাত্রায় উৎসাহিত করেন।

এই যাত্রায় শরচ্চন্দ্র কিছুদিন তাসিলুনপো মঠে ও কিছুদিন নিষিদ্ধ নগরী লাসায় অতিবাহিত করেন। শরচ্চন্দ্রের পূর্বে নয়ন সিং ও কিসেন সিং নামে আর দুইজন মাত্র ভারতীয় যথাক্রমে ১৮৬৬ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লাসায় গিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় তিব্বত ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে কিন্তু ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যতদিন পর্যন্ত রাজা রামমোহনের তিব্বত যাত্রার ঘটনা অবিসংবাদীরূপে প্রমাণিত না হয় ততদিন ইহা বলা যাইতে পারে যে বৃটিশ শাসন-কালে শরচ্চন্দ্রই তিব্বত ভ্রমণকারী প্রথম বাঙ্গালী-সন্তান।

সুদীর্ঘ চৌদ্দমাসকাল তিব্বত-বাস করিয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র বহু পুঁথি সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শরচ্চন্দ্র দ্বিতীয়বার তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে দুইখানি বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন, একটি লাসা

১। Narrative of a Journey to Tashilumpo in Tibet in 1879, Calcutta, 1881.

ভ্রমণের বিবরণী অপরটি পল্‌তি হ্রদ, লোকো, ইয়ালুং এবং সাকিয়ার বিবরণী বা জরিপ প্রতিবেদন। বই দুইখানি যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মুদ্রিত হইলেও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। গভর্নমেণ্টের অনুমতি লাভের পর এই বিবরণী দুইটির কিছু অংশ ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ কণ্টেম্পোরারী রিভিউ (জুলাই, ১৮৯০) ও নাইনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরী (আগস্ট ১৮৯৫) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই বিবরণী দুইটির বহু অজ্ঞাত-ভৌগোলিক তথ্য সমন্বিত সারভাগ একটি পৃথক গ্রন্থাকারে ইংল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত হইয়া ভৌগোলিকরূপে শরচ্চন্দ্রের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করে।[২]

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট তিব্বতীয় অনুবাদক নামে একটি পদের সৃষ্টি করিয়া শরচ্চন্দ্রকে এই পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক প্রয়োজনে শরচ্চন্দ্রকে বাঙ্গলা সরকারের চীফ্‌-সেক্রেটারী কোলম্যান মেকলের সহিত সিকিম প্রেরণ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক প্রয়োজনের জন্য বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট তিব্বতে একদল কর্মচারী প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। এই সময় তিব্বত চীনের অধীন ছিল এবং সরাসরি এক বা একাধিক ইংরাজ কর্মচারীর পক্ষে তিব্বত প্রবেশ অসম্ভব ছিল। এই জন্য বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের চীফ্‌-সেক্রেটারী কোলম্যান মেকলেকে এই অনুমতি সংগ্রহের জন্য পিকিং প্রেরণ করেন। প্রগাঢ় সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্রাভিজ্ঞতার জন্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীনে শরচ্চন্দ্রের সহায়তা বিশেষ কার্যকারী হইবে মনে করিয়া গভর্নমেণ্ট শরচ্চন্দ্রকেও কোলম্যান মেকলের সহিত চীনে প্রেরণ করেন। চীনে অবস্থানকালে অল্পদিনের মধ্যেই শরচ্চন্দ্র তথাকার লামা বা বৌদ্ধপণ্ডিত সন্ন্যাসীদের

২। Journey to Lhasa and Central Tibet Ed. by W. W. Rockhill, London, 1902.

মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তথাকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ শরচ্চন্দ্রের বৌদ্ধধর্মানুরাগ ও বৌদ্ধশাস্ত্র পারঙ্গমতার জন্য তাঁহাকে "কাচেন লামা" অর্থাৎ কাশ্মীর হইতে আগত লামা নামে অভিহিত করিতেন। ইতিপূর্বে তিব্বতে বাসকালে তিব্বতীয় লামারা তাঁহাকে 'খেনছেন' বা 'মহোপাধ্যায়' উপাধি দান করেন।

রাজনৈতিক কারণে চীন-সরকার ইংরাজ রাজকর্মচারীদের তিব্বত প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলে শরচ্চন্দ্র, কোলম্যান মেকলে সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরাজ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল না হইলেও ব্যক্তিগতভাবে শরচ্চন্দ্রের এই চীন ভ্রমণ ব্যর্থ হয় নাই। চীনে অবস্থানকালে বহু চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতের বিশেষতঃ চীনের প্রধান লামা চাং চিয়া হুতুকেতুর সহিত তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। ইঁহাদের সাহচর্যে শরচ্চন্দ্রের বৌদ্ধশাস্ত্র জ্ঞান বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার, তিব্বত হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রাদি উদ্ধার ও তিব্বতীয় ভাষায় পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি-স্বরূপ শরচ্চন্দ্রকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার দশ বৎসর পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন।

দুইবার তিব্বত ও একবার চীন ভ্রমণ করিয়া শরচ্চন্দ্র ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম এই দুই দেশে কিভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা অধ্যয়নের সুযোগ পান কিন্তু ইহাতেও তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য শরচ্চন্দ্র শ্যামদেশে (তাইল্যাণ্ড) গমন করেন। এই স্থানে কিছুকাল ধরিয়া তিনি রাজকুলজাত-বৌদ্ধপণ্ডিত বজ্রজ্ঞান বরোরসের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শরচ্চন্দ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া শ্যামদেশের অধিপতি তাঁহাকে "তুষিতমত" পদক দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।

দুইবার তিব্বত ভ্রমণ করিয়া এই দেশ ও সন্নিহিত অঞ্চল সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র ইংরাজী ভাষায় যে সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেন

উহা বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত "রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি" ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের নিমিত্ত তাঁহাকে একটি পারিতোষিক প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

দুইবার তিব্বত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় শরচ্চন্দ্র দুই শতেরও অধিক পুঁথি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় ও সংগ্রহ করিয়া আনেন। এই পুঁথিগুলির মধ্যে বেশির ভাগ ছিল সংস্কৃত গ্রন্থ অথবা সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। এই সব গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র রচিত "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা" নামীয় সংস্কৃত গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতায় ভগবান বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে কি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিরূপে বোধিলাভ করিয়াছেন তাহা বিবৃত আছে, প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ ধর্মমূলক উপদেশও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র দশম বা একাদশ শতাব্দীর শেষে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্র রচিত এই সংস্কৃত কাব্যের একটি পুঁথি (প্রতিলিপি বা 'কপি') তিব্বতে নীত হয়। লক্ষ্মীশ্বর নামক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে লোচবা নামক এক স্থানীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে এই পুস্তকের তিব্বতীয় অনুবাদ ও সংস্কৃত মূল (তিব্বতী অক্ষরে) কাষ্ঠ খোদাই হইয়া তিব্বতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা পঠিত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাষ্ঠখোদাই এই পুস্তকের (Xylograph) একটি খণ্ড শরচ্চন্দ্র তিব্বত হইতে সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইতিপূর্বে নেপাল হইতে এই পুস্তকের সংস্কৃত ভাগের একাংশ মাত্র সংগৃহীত হইয়া কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হইয়াছিল। ভারতীয় মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের সম্পূর্ণ রচনাটি শরচ্চন্দ্র কর্তৃক তিব্বত হইতে আনীত হওয়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি শরচ্চন্দ্রকে উহা প্রকাশের ভার অর্পণ করেন। সোসাইটির অনুরোধে শরচ্চন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের একটি খণ্ড সোসাইটিতে

রক্ষিত নেপালে প্রাপ্ত পুঁথির সহায়তায় মিলাইয়া সম্পাদন ও প্রকাশ করেন।[৩] পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুরোধে শরচ্চন্দ্র চারিখণ্ডে এই মহাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রনয়ণ করিয়া প্রকাশ করেন।[৪]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত "অভিসার" কবিতাটির (কথা ও কাহিনী) সহিত বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকামাত্রেরই পরিচয় আছে। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতাই এই কবিতাটির উৎস। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে এই গ্রন্থটি শরচ্চন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশের পর ১৩০৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীমূলক এই অনুপম কবিতাটি রচনা করেন। শরচ্চন্দ্র সম্পাদিত "বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা" পাঠ করিয়া যে রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীটির সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না।

শরচ্চন্দ্র অনেকগুলি বাঙ্গলা ও ইংরাজী সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন এবং কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি-কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮১ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (জার্নালে) ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, বৌদ্ধধর্ম, লোক-যান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার ৩২টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সোসাইটির সম্মানিত সহযোগী সদস্য (এসোসিয়েট্ মেম্বর) শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই শরচ্চন্দ্র ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্রকে পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' শ্রেণীভুক্ত করা হয়। শরচ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর পরিষদ্ ভবনে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি (তৈল চিত্র) রক্ষিত হইয়াছিল।

৩। Avadana Kalpalata (Bibliotheca Indica) Calcutta, 1888.

৪। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা (১-৪ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ১৩১৯—১৩২২।

নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া শরচ্চন্দ্র মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দান করিতেন। নানাস্থানে তাঁহার দ্বারা প্রদত্ত ইংরাজী ভাষণগুলি একত্রিত করিয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (ইণ্ডিয়ান পণ্ডিতস্ ইন্ দি ল্যাণ্ড অফ্ স্নো") ।[৫] তুষার দেশে ভারতীয় পণ্ডিত নামে এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া জানা যায় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে যাইয়া কিভাবে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার করিয়াছিলেন। ভারত সভ্যতার তিব্বত জয়ের বিস্মৃত অধ্যায়টি ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে শরচ্চন্দ্রই সর্বপ্রথম তিব্বতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সূত্রে অবগত হইয়া বিশ্বসমাজে তাহা প্রচার করেন। এ বিষয়ে তাঁহাকেই পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে।

গভীরভাবে তিব্বতীয় ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে গিয়া শরচ্চন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে খ্রীষ্টিয় ৭ম শতাব্দী হইতে তিব্বতীয় সাহিত্যের যে বিবর্তন হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে একান্তভাবে ভারতীয় সাহিত্য, এবং তিব্বতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে ভারতীয় সাহিত্যের লুপ্ত অংশোদ্ধারও সম্ভবপর হইতে পারে। বঙ্গীয় সরকারের তিব্বতীয় ভাষানুবাদকরূপে তিনি গভর্নমেণ্টকে একটি তিব্বতী-ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করাইতে সমর্থ হন। অতঃপর সরকারের অনুমতি লইয়া তিনি সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় একটি তিব্বতী-ইংরাজী অভিধান (সংস্কৃত সমার্থক শব্দসহ) সঙ্কলন কার্য সম্পন্ন করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সুবৃহৎ আকারে ১৩৫০ পৃষ্ঠাযুক্ত এই অভিধানটি প্রকাশিত হয়।[৬] ইতিপূর্বে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে Cosma de Coros ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে Heinrich August Jascke রচিত তিব্বতী অভিধানদ্বয়ের

৫। **Indian Pandits in the Land of Snow, Calcutta, 1893.**

৬। **Tibetan-English Dictionary with Sanskrit synonyms, Calcutta 1902, (Reprinted 1960).**

অপেক্ষা শরচ্চন্দ্র সঙ্কলিত অভিধানটির শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্র ছিল বহু ব্যাপকতর। ভারত-বিদ্যা চর্চার পূর্ণাঙ্গতা সাধনে অধুনা তিব্বতীয় ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শরচ্চন্দ্রের অভিধান দ্বারা তিব্বতীয় ভাষা চর্চার পথ কতদূর সুগম হইয়াছে যাঁহারা তিব্বতীয় ভাষা চর্চা করেন তাঁহারাই ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার তিব্বতীয় ভাষা চর্চার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থটি অবিকল পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এই অভিধান ব্যতীত তিব্বতী ভাষা শিক্ষার জন্য শরচ্চন্দ্র আরও কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন ; ইহার মধ্যে একটি তিব্বতীয় ব্যাকরণ পাঠ্যপুস্তকের নাম উল্লেখযোগ্য।[৭]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত শরচ্চন্দ্র কলিকাতায় "বুদ্ধিস্ট্ টেক্সট্ য়্যাণ্ড রিসার্চ সোসাইটি" নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজে ইহার পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় এই সোসাইটির অগ্রগতিতে শরচ্চন্দ্রকে প্রভূত সহায়তা দেন। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধদেশগুলিতে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি অনুসন্ধান ও এই সব দেশে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশ ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। এই সংস্থার উদ্যোগে শরচ্চন্দ্র কর্তৃক অনেকগুলি দুর্লভ সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। এই সমিতির মুখপত্রটির (জার্নাল) সম্পাদন কার্যও শরচ্চন্দ্র সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সম্পন্ন করেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শরচ্চন্দ্র নিরলসভাবে নিজেকে সাহিত্য চর্চায় ও বুদ্ধিস্ট্

৭। An Introduction to the Grammar of Tibetan Language, Darjeeling, 1915.

টেক্সট্ সোসাইটির সেবায় নিযুক্ত করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র ক্ষেমেন্দ্র রচিত অপর একটি পুস্তক "চারুচর্যা শতক"-এর একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ক্ষেমেন্দ্র রচিত এই সংস্কৃত কাব্যটিও তিনি তিব্বত হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। এই গ্রন্থে রামায়ণ মহাভারতের উপদেশগুলি পদ্যাকারে সংগৃহীত হইয়াছে।[৮]

পরিণত বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহা এতদূর বলবতী ছিল যে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে একায় কাওয়াগুচি নামে একজন জাপানদেশীয় বৌদ্ধপণ্ডিতের সহিত বৌদ্ধশাস্ত্রাধ্যায়নের জন্য তিনি জাপান যাত্রা করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করেন। জাপানে বৌদ্ধধর্মাচার্যেরা শরচ্চন্দ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট তিব্বত ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের ভৌগোলিক তথ্যানুসন্ধানের পুরস্কারস্বরূপ শরচ্চন্দ্রকে চট্টগ্রাম জেলায় পুরুষানুক্রমে ভোগের জন্য ১৪০০ শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। শরচ্চন্দ্র এই সম্পত্তি নিজে ভোগ না করিয়া পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ক্রমদীশ্বর শিবের সেবায় অর্পণ করেন। লুপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচার কার্যে আজীবন ব্যয়িত হইলেও আনুষ্ঠানিকভাবে শরচ্চন্দ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত সদ্ধর্মের লক্ষ্য হইল মানুষের শিক্ষা ও আত্মার পবিত্রতা সাধন। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম যে সনাতন হিন্দু ধর্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে শরচ্চন্দ্র দৃঢ়ভাবে এই মতই পোষণ করিতেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি (২১শে পৌষ, ১৩২৩) চট্টগ্রাম শহরের অদূরবর্তী দেবপাহাড় নামক স্থানে শরচ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, পাঁচ পুত্র ও সাতটি কন্যা রাখিয়া যান। শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র দাশ (১৮৫৩-১৯১৪)

৮। চারুচর্যাশতক—কলিকাতা, ১৯১০।

একজন শক্তিশালী কবি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য অপূর্ব দক্ষতার সহিত বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। শরচ্চন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বেই নবীনচন্দ্রের দেহান্ত হয়।

শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু, উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত এবং সন্নিহিত অঞ্চল সম্বন্ধে তিনি যেসব ভৌগোলিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক তথ্য আহরণ করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তিব্বত হইতে লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি উদ্ধার ও প্রচার এবং তিব্বতী ভাষায় অভিধান রচনা দ্বারাও বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অনেকে মনে করেন যে শরচ্চন্দ্র বৃটিশ সরকারের গুপ্তচররূপে তিব্বতে গিয়াছিলেন এবং বৃটিশ ঔপন্যাসিক কিপলিঙের 'Kim' উপন্যাসের বাঙালী গুপ্তচর চরিত্রটি তাঁহাকে আদর্শ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। শরচ্চন্দ্র যে বৃটিশের গুপ্তচররূপে তিব্বত ভ্রমণে যান নাই, এ কথা নিশ্চিত-রূপে বলা যাইতে পারে। তিনি নিজের আত্মবিবরণীতে লিখিয়াছেন যে অতীতে ভারতীয় পণ্ডিতদের তিব্বত-ভ্রমণ ও জ্ঞান-প্রচারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই পবিত্র দেশের অনুপম সৌন্দর্য দেখিতে ও জ্ঞানসঞ্চয় করিতেই তিনি সে দেশে যান, কোন বৈষয়িক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত-তিব্বত সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শরচ্চন্দ্র নিজের সাধনা দ্বারা এই মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতও করিয়া গিয়াছেন। যে কোন দেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য আহরণের অধিকার যে কোনও মানুষেরই আছে। সভ্য রাষ্ট্রমাত্রই এই অধিকার বিদেশীকেও দিয়া থাকেন। তিব্বত ভ্রমণ করিয়া নানা তথ্য আহরণের পর পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রচার দ্বারা শরচ্চন্দ্র তিব্বত রাষ্ট্র বা তিব্বতের জনসাধারণের প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেন

নাই। শরচ্চন্দ্রের তিব্বত ত্যাগের পর তিব্বত সরকার শরচ্চন্দ্রের আশ্রয় দাতা পাঞ্চেন লামার প্রধানমন্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করিয়া পরে তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মধ্যযুগীয় মনোভাব-সম্পন্ন কয়েকজন ক্ষমতান্ধ রাষ্ট্রনিয়ন্তা অমূলক সন্দেহ বশে শরচ্চন্দ্রের আশ্রয়দাতা বন্ধুকে হত্যা করিয়াছিলেন এই ঘটনা হইতে শরচ্চন্দ্র যে বৃটিশচররূপে তিব্বতে গিয়াছিলেন ইহা প্রমাণিত হয় না।

শরচ্চন্দ্রকে ইংরাজের গুপ্তচর বলিয়া ভাবিলে এই স্বাধীনচেতা, তেজস্বী, ধর্মনিষ্ঠ, বন্ধু-বৎসল জ্ঞান-ভিক্ষু পরিব্রাজকের উপর ঘোরতর অবিচার করা হইবে। কল্পনা-কুশলী ঔপন্যাসিকের অলস কল্পনা জৃম্ভন দ্বারা শরচ্চন্দ্রের চরিত্র হনন সর্বতোভাবে অসমর্থনীয়।

গুপ্তচর বৃত্তির সহিত যে বিশ্বাসঘাত-প্রবণতা ওতপ্রোতরূপে জড়িত থাকা প্রয়োজন শরচ্চন্দ্রের চরিত্রে তাহার লেশমাত্রও ছিল না। শরচ্চন্দ্রের তিব্বত-ভ্রমণ দ্বারা তিব্বতবাসী ও তিব্বত রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হইয়াছিল উত্তরকালের ইতিহাসে তাহার সামান্য মাত্রও পরিচয় পাওয়া গেলে তাঁহাকে বৃটিশের গুপ্তচর বলা চলিত। পরন্তু তিব্বতের ধ্যানগম্ভীর-সৌন্দর্য ও তাহার সুমহান সংস্কৃতির প্রচার দ্বারা শরচ্চন্দ্রই সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি তিব্বতের দিকে আকৃষ্ট করেন। সুতরাং তিব্বত ও তিব্বতবাসীর তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তিব্বত হইতে লুপ্ত ভারতীয়শাস্ত্র-সাহিত্য উদ্ধারও তাঁহার জীবনের অন্যতম কীর্তি।

কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলাঙ

(১৮৫০—১৮৯৩)

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট বোম্বাই শহরে এক ধর্মনিষ্ঠ গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে কাশীনাথের জন্ম হয়। এই পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল পশ্চিম উপকূলে গোয়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই পরিবার জীবিকাব্যপদেশে গোয়া ত্যাগ করিয়া বোম্বাই-এর অনতিদূরে থানা নামক স্থানে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে পরিবারটি বোম্বাই-এ চলিয়া আসেন। কাশীনাথের পিতামহের নাম ছিল রামচন্দ্র তেলাঙ্। রামচন্দ্রের দুই পুত্রের নাম ছিল ত্রিম্বক্ ও বাপুভাই। কাশীনাথ এই বাপুভাই-এর মধ্যম পুত্র। বাপুভাই-এর অগ্রজ ত্রিম্বক্ নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, এই জন্য তাঁহার নাম হইয়া যায় কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলাঙ্।

বাল্যকালেই কাশীনাথ সবিশেষ মেধার পরিচয় দেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর এল্‌ফিন্‌স্টোন্ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পাঁচ বৎসর পরেই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে অধ্যয়নের সময়েই তিনি ইংরাজী, মারাঠী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তেলাঙ্ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। পর বৎসর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি এম. এ., ও এল. এল. বি. উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সব পরীক্ষাগুলিতে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি বহু পারিতোষিক ও বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্ররূপে অধ্যয়ন কালে ব্যয় নির্বাহের জন্য তেলাঙ্ প্রথমে এল্‌ফিন্‌স্টোন্ হাইস্কুলে ও পরে এল্‌ফিন্‌স্টোন্ কলেজে সংস্কৃত পড়াইতেন। কাশীনাথের সংস্কৃত জ্ঞান কত গভীর ছিল ইহা হইতে তাহার প্রমাণ

পাওয়া যায়। এম. এ., ও এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষা অধিকর্তা কাশীনাথকে ৩০০্ টাকা বেতনে একটি সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। তৎকালে একজন শিক্ষিত যুবকের পক্ষে এই বেতন ও এই পদ যথেষ্ট লোভনীয় ছিল। কাশীনাথ এই পদের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া আইন-ব্যবসায়ে ব্রতী হইতে মনস্থ করেন। শিক্ষানবিসি অন্তে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথ বোম্বাই হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ী-রূপে যোগদান করেন। অচিরকালের মধ্যেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী বলিয়া পরিগণিত হন। সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য হিন্দু-আইন বিষয়ে তিনি তাঁহার সময়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। যেসব দুরূহ মামলায় তিনি কোন পক্ষে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন না সেই সব ক্ষেত্রে অন্য আইনজীবিগণ এমন কি বিচারকেরাও পরামর্শের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইতেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলাঙ্ মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। বিচারপতি থাকা কালেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তেলাঙ্-এর জীবনান্ত হয়।

বাল্যকাল হইতেই জনসেবা তথা দেশসেবা ও বিদ্যাচর্চা কাশীনাথের জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই জন্য সরকারী চাকুরির প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া তিনি আইন ব্যবসায়ীর স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করেন। আইন ব্যবসায়ে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অচির সংগঠিত বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির যথেচ্ছাচার রোধ ও সুষ্ঠু পরিচালনের উদ্দেশ্যে করদাতৃসমিতির- প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার ফলে মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত একটি আইন বিধিবদ্ধ হয় ও মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন ব্যবস্থা কয়েকজন মনোনীত ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত হয়। কাশীনাথ দীর্ঘকাল 'কাউন্সিলার' রূপে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির (করপোরেশন) সেবা করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লর্ড লিটন

ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। কাশীনাথ এই স্বৈরাচারী শাসকের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করিতে অগ্রণী হন। লর্ড লিটনের রেভিনিউ জুরিসডিক্সন এক্ট (১৮৭৬), লাইসেন্স এক্ট, ভারনাকুলার প্রেস এক্ট প্রভৃতির প্রতিবাদে তিনি বহু সভায় বক্তৃতা করেন ও পুস্তকাদি প্রচার করেন। বয়োবৃদ্ধ-দেশপ্রেমিক দাদাভাই নৌরোজী ছিলেন কাশীনাথের রাজনৈতিক গুরু ; ফিরোজ শা মেটা, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রভৃতি কাশীনাথের সহযোগী ছিলেন। ১৮৮৫—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীনাথ বোম্বে প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি পদের দায়িত্ব অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালন করেন। ইহার পূর্বে তিনি দাদাভাই নৌরোজী প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের বোম্বাই শাখার সেক্রেটারি পদেও কাজ করিয়াছিলেন। এই তুইটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস) প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করিতে কাশীনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সম্পাদক। এই অধিবেশনে শাসনসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবটি কাশীনাথ দ্বারাই উত্থাপিত হয়। অপর একটি প্রস্তাব—ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বিলুপ্তির সমর্থনে কাশীনাথ একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন। কংগ্রেসের পরবর্তী তুইটি অধিবেশনে অসুস্থতার জন্য তেলাঙ্ যোগদান করিতে পারেন নাই। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সার জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে শাসনসংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি এবারও তেলাঙ্ কর্তৃক উত্থাপিত হয়। এই অধিবেশনে কাশীনাথ সরকারী শিক্ষানীতির-বিরুদ্ধে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলাঙ্ বোম্বাই হাইকোর্টের

বিচারপতি হইলে অতঃপর কংগ্রেসে সক্রিয়ভাবে যোগদান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথের মৃত্যুর পর এই বৎসরের অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে দাদাভাই নৌরোজী বলেন যে কাশীনাথের মৃত্যু দেশের পক্ষে একটি বিরাট ক্ষতি।

১৮৮৪ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীনাথ বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এই সভার সদস্যরূপে তিনি গভর্নমেণ্টকে বহু জনকল্যাণমূলক কর্ম করিতে অনুপ্রাণিত করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল বিলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জন-স্বার্থের বিরোধী কোন প্রচেষ্টা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে কাশীনাথের তীব্র প্রতিবাদ ও যুক্তিজাল সরকারকে এই পন্থা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিত। দেশে শিক্ষা-বিস্তার ও শিক্ষা-সংস্কার তেলাঙ্-এর জীবনের পরম ঈপ্সিত বিষয় ছিল। বোম্বাই প্রদেশে "স্টুডেণ্টস সায়েন্টিফিক য়্যাণ্ড লিটারারী সোসাইটি" নামক সংস্থা অনেকগুলি বিদ্যালয় পরিচালন করিত, তেলাঙ্ আজীবন এই সংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহুকাল ধরিয়া তেলাঙ্ বোম্বাই-এর সরকারী আইন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সংস্কার করা হয়। ১৬ বৎসর কাল তেলাঙ্ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন, এক বৎসরের কিছু বেশী সময়ের জন্য তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সলার) নিযুক্ত হন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। এই পদে আসীন থাকা কালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বোম্বাই মিউনিসিপালিটি কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনাটি তিনি ও তাঁহার সহকর্মী-সুহৃৎ ফিরোজ শা মেটাই প্রস্তুত করেন। শিক্ষা প্রসারে কাশীনাথের নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার তাঁহাকে "ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন ১৮৭২"-এর সদস্য মনোনীত করেন।

এই কমিশন প্রত্যেকটি প্রদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া এক

একটি পৃথক প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রকাশ করে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রিপোর্টে প্রধানতঃ তেলাঙেরই মতামত প্রতিফলিত হয়, যদিও এই রিপোর্টটি তিনি রচনা করেন নাই। তেলাঙ্ অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল তথাপি তিনি রিপোর্টে এই মত প্রকাশ করেন যে প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষার বদলে দেশে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা-প্রচার আবশ্যক, অবশ্য প্রাচীন চতুষ্পাঠী প্রভৃতির রক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালনের তিনি বিরোধিতা করেন নাই। তেলাঙ্ এই মত প্রকাশ করেন যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাই ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলকর হইবে।

ইহার অর্ধশতাব্দীরও পূর্বকালে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তে গভর্নমেণ্ট শুধু সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন তখন বাঙ্গালা দেশে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টের নিকট ইহার প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে কাশীনাথ ত্রিম্বকের চিন্তাধারায় রামমোহনের চিন্তারই প্রভাব লক্ষিত হয়। কাশীনাথ ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত হইতে পরামর্শ দেন। কাশীনাথের মতানুসারে উত্তরকালে সরকারের শিক্ষানীতি পরিচালিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও উপাচার্য হিসাবে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজনীতিজ্ঞ, আইন ব্যবসায়ী ও শিক্ষাবিদ্‌রূপে কাশীনাথ তাঁহার জীবদ্দশায় একজন দিক্‌পাল হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ছিল সংস্কৃত-শাস্ত্র ও সাহিত্য-চর্চা। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে নিজের রুচিমত বিষয়টি বাছিয়া লইয়া জীবন-যাপনের সুবিধা থাকিলে তিনি আইন ও রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া

শুধুমাত্র বিদ্যাচর্চাতেই সুখী হইতে পারিতেন। ভারতবিদ্যা সাধনার ক্ষেত্রে কাশীনাথ ত্রিম্বকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

ছাত্রাবস্থায় তেলাঙ্‌ অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, আজীবন তিনি এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। মাত্র ২২ বৎসর বয়সের সময় একটি সভায় তেলাঙ্‌ ইংরাজী ভাষায় "রামায়ণ কি হোমরের দ্বারা প্রভাবিত?" (ওয়াজ্‌ রামায়ণ কপিড ফ্রম হোমার?) এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ভেবরের মত এই ছিল যে রামায়ণ হোমর রচিত ইলিয়ড্‌ ও অডিসির পরবর্তী রচনা, সীতা-হরণ ও লঙ্কা-আক্রমণ ঘটনা হোমরের ইলিয়িড কাব্যের হেলেন-হরণ ও ট্রয়-অবরোধ কাহিনীর অনুকরণে রামায়ণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলি হইতেও রামায়ণ রচনায় সাহায্য লওয়া হইয়াছে এবং রামায়ণ খ্রীষ্টজন্মের পরবর্তী কালের রচনা।

কাশীনাথ তাঁহার প্রবন্ধে ইহাই পরিস্ফুট করেন যে গ্রীকেরা নানা বিভাগে হিন্দুদের নিকট ঋণী, সুতরাং রামায়ণের সীতা-হরণ ও লঙ্কা-আক্রমণ ঘটনাটি হোমরই রামায়ণ হইতে ধার করিয়াছেন ইহা অসম্ভব নহে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা সনাতন হিন্দুধর্মের সাহিত্য ও শাস্ত্রকে অনেক সময় নিজেদের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন ইহার প্রমাণ আছে, সুতরাং দশরথ-জাতক রামায়ণের নিকট ঋণী, রামায়ণ জাতকের নিকট ধার করা বস্তু নহে। জ্যোতিষিক ও ভৌগোলিক সাক্ষ্য দ্বারা তেলাঙ্‌ রামায়ণ যে খ্রীষ্ট পরবর্তী কালে রচিত নহে ইহা প্রমাণ করেন। অতঃপর পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক এই বিষয়ে তেলাঙের মতবাদই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। এই রচনাটি একটি পুস্তিকারূপে ও পরে ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১] ডঃ লরিনজার নামে একজন জার্মান পণ্ডিত এইমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভগবদ্‌গীতা বুদ্ধের পরবর্তী কালে রচিত। কাশীনাথ এই মতের প্রতিবাদেও একটি

প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে তিনি লেখেন যে নিউ টেস্টামেণ্টের কোন কোন অংশের সহিত ভগবদ্‌গীতার ভাব-সাদৃশ্য থাকায় পণ্ডিত প্রবর লরিনজার অনুমান করিয়াছেন—বুদ্ধ-পরবর্তীকালে গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়া কোন ব্রাহ্মণ গ্রীকদের নিকট নিউ টেস্টামেণ্টের ভাবগুলি ধার করিয়া ভগবদ্‌গীতা রচনা করিয়াছেন। এই ধারণা যুক্তিহীন বরং ইহাই সম্ভব যে কোন গ্রীক পণ্ডিত এদেশে আসিয়া ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে ভাল অংশগুলি লইয়া নিউটেস্টামেণ্ট রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথের এই প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত ভগবদ্‌গীতার ইংরাজী পদ্যানুবাদ গ্রন্থের ভূমিকারূপে সন্নিবিষ্ট হয়। এই ভূমিকাটিতে উক্ত জার্মান পণ্ডিতের মতটিই শুধু খণ্ডন করা হয় নাই উহাতে গীতার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বও প্রতিপাদিত হয়।[২] ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তেলাঙ্‌ ভর্তৃহরির নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক গ্রন্থ দুইটি টীকাসহ সম্পাদন করেন। এই সুসম্পাদিত গ্রন্থটি ব্যূল্যর্‌ ও কীলহর্ন প্রবর্তিত বোম্বে সংস্কৃত সিরিজ গ্রন্থমালার নবম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।[৩] এই গ্রন্থটি অধিকতর সুচারুভাবে সম্পাদিত হইয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তেলাঙ্‌ বিশাখদত্ত রচিত মুদ্রারাক্ষস নাটকটি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন, এই পুস্তকটিও বোম্বে সংস্কৃত সিরিজের ২৭ সংখ্যক পুস্তক-রূপে প্রকাশিত হয়।[৪] ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বারাণসী, পুণা, কোলাপুর ও দক্ষিণ-ভারত হইতে সংগৃহীত ৮ খানি পুঁথির সহায়তায় তেলাঙ্‌ ইহার শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কাশীনাথ বিশাখদত্তের কাল ও এই নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেন। পরে পৃথক পৃথক প্রবন্ধে কাশীনাথ বাণ, সুবন্ধু, কুমারিল, ভর্তৃহরি, কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের কাল সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন।[৫]

কাশীনাথ রচিত ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলিও উত্তরকালে গবেষকদের বিশেষ সহায়তা দান করিয়াছে।[৬] এই প্রবন্ধগুলি আইন ব্যবসায়ী কাশীনাথের সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথ তেলাঙ্‌ কৃত ভগবদ্‌গীতার ইংরাজী অনুবাদ বিবুধকুলপতি ম্যাক্স মুল্ল্যর্‌ সম্পাদিত "সেক্রেড্‌ বুকস অফ্‌ দি ঈস্ট" গ্রন্থমালার অষ্টম খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়।[৭] অন্য পণ্ডিতদের লিখিত গ্রন্থের সমালোচনা কার্যেও কাশীনাথের সমধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইত। ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী পত্রিকায় তাঁহার লিখিত পুস্তক সমালোচনাগুলি বিদগ্ধ জনের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। সংস্কৃত সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন-ইতিহাস আলোচনাতেও তিনি অতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, ঐতিহাসিক বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৮]

কাশীনাথের মাতৃভাষা ছিল মারাঠী। স্বদেশপ্রেমিক কাশীনাথ তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করিতেন। এই সময় শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয়গণ মারাঠী ভাষার চচা না করিয়া ইংরাজী ভাষাতেই তাঁহাদের মনোযোগ ন্যস্ত করিতেন। কাশীনাথের ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখকদের মধ্যে কাশীনাথকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ পটুত্বলাভ করিয়াও তেলাঙ্‌ মারাঠী ভাষার চর্চায় বিরত ছিলেন না। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে তিনি একটি ইংরাজী পুস্তক মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করেন (স্থানিক রাজ্য ব্যবস্থা, ১৮৮৫)। এই সময় লর্ড রিপনের শাসনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (লোক্যাল সেল্‌ফ গভর্নমেণ্ট) প্রবর্তিত হইতেছিল। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ সুষ্ঠুভাবে যাহাতে পৌরসভা, জেলাবোর্ড প্রভৃতির দায়িত্বগ্রহণ করিতে পারে ইহাই ছিল তাঁহার এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে

শিক্ষা ও আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে কাশীনাথ একটি জার্মান ভাষার নাটক মারাঠীতে অনুবাদ করেন (শাহানা নেথন, ১৮৮৭)। উৎকৃষ্ট বিদেশী গ্রন্থের মারাঠী অনুবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই-এ "মহারাষ্ট্র ভাষা সংবর্ধক মণ্ডল" নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইলে কাশীনাথ উহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার উৎসাহে বহু মারাঠী-পণ্ডিত বিদেশী গ্রন্থের মারাঠী-অনুবাদ প্রকাশ করেন, এই কার্যের দ্বারা মারাঠীভাষা সমৃদ্ধ হয় এবং এই দৃষ্টান্তে শিক্ষিত মারাঠীরা মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার কেশরী পত্রে কাশীনাথের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের দিকে মহারাষ্ট্রীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার আদর্শে সকলকে উদ্‌বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন (কেশরী, ২৩-৯-১৮৯১)। প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য ও ইতিহাস কাশীনাথ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কাশীনাথের লিখিত "গ্লিনিঙ্গ্‌স্ ফ্রম মারাঠা ক্রনিকলস্" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ মহাদেব গোবিন্দ রানাডে লিখিত "রাইজ অব্ মারাঠা পাওয়ার" গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়রূপে সন্নিবিষ্ট হয়।

কাশীনাথ অতিশয় বিনয়ী ও মধুর স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। হিন্দুধর্মে প্রগাঢ়-নিষ্ঠাবান সর্বভূতে সমদর্শী এই মনীষী দেশের হিন্দু, মুসলমান, পার্শী-সকলেরই সমপরিমাণ শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তেলাঙের অকাল মৃত্যুতে শুধু ভারতবাসী নহেন তাঁহার ইউরোপীয় অনেক বন্ধুও মর্মাহত হন। তেলাঙের মৃত্যুতে সুদূর বাঙ্গলা দেশও শোকগ্রস্ত হয়। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান মিরর, ইণ্ডিয়ান নেশন ও রেইস এণ্ড রায়ট্ পত্রে তেলাঙের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

[দ্রষ্টব্য : **Telang's Legislative Speeches with Sir Raymond West's essay on his life—Ed. by D. W. Philgaonkar, Bombay, 1895 ; Select Writings and Speeches Vol. I & II, Gour Saraswat Brahmin Mitra Mandal, Bombay, (1916, 1927) ; A Literary History of India (K. T. Telang), Pp. 433—446, London, 1915 ; K. T. Telang by**

V. N. Naik, G. A. Natesan, Madras 1932; Indian Judges—G. A. Natesan, Madras, 1932; Representative Indians—G. P. Pillai. London, 1897 (Pp. 267—277); K. T. Telang—Pub. by Telang Centenary Committee, Bombay, 1951, etc. etc.]

(১) Note on Ramayana—Indian Antiquary, Sept., 1874. (Also Pub. as a pamphlet, Bombay, 1872).

(২) Bhagawadgita—Translated into English verse with notes and an introductory essay, Bombay, 1875.

(৩) The Nitisataka and Vairagyasataka of Bhartrihari. Ed. with Notes—Bombay Sanskrit Series, No. 9, 1874, 2nd edn. 1885, 3rd edn. 1893.

(৪) Mudrarakshasa by Visakhdatta with commentary, indroduction and explanatory notes—Bombay Sanskrit Series, No. 27, 1884.

(৫) (i) The date of Nyaya Kusumanjali—I.A., Oct., 1872. (ii) The date of Sriharsa, I.A., March, 1873. (iii) Kalidasa, Sri Harsha and Chand, I.A., March, 1874. (iv) Ramayana older than Patanjali, I.A., April, 1874. (v) A note on the Age of Madhusudan Saraswati—Journal of Royal Asiatic Soc., Bombay Branch, Vol. 8. (vi) Life of Sankaracharya, Philosopher & Mystic, The Theosophist, Jan., 1880; May, 1880. (vii) The date of Sankaracharya, I.A., April, 1884. (viii) Punarvarma and Sankaracharya—J. B. B. R. A. S., Vol. XVII. (ix) Subandhu and Kumarila—J. B. B. R. A. S., Vol. XVIII.

(৬) (i) Note on Gomutra, I.A., Oct., 1872. (ii) Note on the Nyaya Kusumanjali, I.A., Nov., 1872. (iii) The Parvati Parinaya of Bana, I.A., Aug., 1874. (iv) Kalidasa and Sriharsa I.A., March, 1875. (v) The Sankarvijaya of Anandagiri, I.A., Oct, 1876. (vi) Gleanings from the Sariraka Bhashya of Sankaracharya—J. B. B. R. A. S., 1890.

(৭) Bhagawadgita with Sanatsujatiya and Anugita, Eng. Trans. (Sacred Books of the East, Vol. VIII), Oxford, 1882.

(৮) (i) A new Chalukya Copper plate—J. B. B. R. A. S., Vol. X. (ii) Three Kadamba Copper plates J. B. B. R. A. S., Vol. XII. (iii) A new Sitara Copper plate, I.A., Feb., 1880. (iv) The Copper plate grant of Pulakesin II, I.A., Dec., 1885.

আনন্দরাম বরুয়া

(১৮৫০—১৮৮৯)

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আসামের উত্তর গৌহাটি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে আনন্দরামের জন্ম হয়। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরস্থ এই উত্তর গৌহাটি জনপদের অপর পারেই কামরূপ জেলার প্রধান শহর গৌহাটি অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আহোম নৃপতি চুখাম্‌পার রাজত্বকালে দুর্গাচরণ বসু নামে বঙ্গদেশাগত এক ব্যক্তি চুখাম্‌পার বিশেষ প্রীতি অর্জন করেন। ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া চুখাম্‌পা ইঁহার নূতন নাম দেন মানিকচন্দ্র বরকাকতি। রাজকার্যের পুরস্কারস্বরূপ চুখাম্‌পা ইঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে এই বঙ্গজ কায়স্থ পরিবার "মাজিন্দার বরুয়া" নামে পরিচিত হয় ও অসমীয়া সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মানিকচন্দ্র নিজে আহোম রাজধানী গড়গাঁও-এ বাস করিতেন। তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ গর্গরাম উত্তর গৌহাটিতে বসবাস করেন। ইনি আসামে বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে সদর আমিন-এর (মুন্সেফ) পদ প্রাপ্ত হন। আনন্দরাম বরুয়া এই গর্গরাম বরুয়ার তৃতীয় পুত্র। সাত বৎসর বয়সের সময় আনন্দরামের মাতৃবিয়োগ হয়। গর্গরাম সাতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুত্রগণকে বাড়ীতে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিতদের নিকট প্রাচীন প্রথায় সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আনন্দরাম বাল্যকালেই সংস্কৃতে পারদর্শী হন। উত্তর গৌহাটি ও গোয়ালপাড়া বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করার পর আনন্দরাম গৌহাটি হাইস্কুলে দুই অগ্রজ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন এবং এই স্কুল হইতেই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃত্তিসহ এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে গৌহাটিতে কোন

কলেজ না থাকায় আনন্দরাম কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি উত্তরকালের কৃতী ব্যক্তিগণ আনন্দরামের সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে পাঠানুরাগ, মেধাশক্তি ও স্বভাব মাধুর্যের জন্য আনন্দরাম শিক্ষক ও সহপাঠীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম ষষ্ঠ স্থান অধিকারপূর্বক এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, গণিতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করার জন্য তিনি ডাফ্ স্কলারশিপও লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিপূর্বে তাঁহার সহপাঠী রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত এবং তাঁহার কলেজের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র উত্তরকালের দেশ-বিখ্যাত জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "আই. সি. এস্."-এ পদ লাভের জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কলেজের এই তিনজন কৃতী ছাত্রের দৃষ্টান্তে আনন্দরামের মনেও আই. সি. এস. পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ইংল্যাণ্ডে যাত্রার বাসনা জন্মে। আনন্দরামের পিতা রক্ষণশীল ব্যক্তি ছিলেন, ইংল্যাণ্ড যাত্রার জন্য তাঁহার সম্মতি ও অর্থ সাহায্য পাওয়া সহজ হইবে না বুঝিতে পারিয়া আনন্দরাম পরীক্ষা দিয়া "গিল্‌ক্রাইস্ট" বৃত্তি অর্জন করেন। তাঁহার হিতৈষী শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে তাঁহাকে সরকারী বৃত্তি (স্টেট স্কলারশিপ) পাইতেও সাহায্য করেন। এই দুইটি বৃত্তি পাইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে আনন্দরাম নিশ্চিন্ত মনে অধ্যয়নার্থ ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া পর বৎসর আনন্দরাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি. শ্রেণীতে ভর্তি হন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি "মিড্‌ল টেম্প্‌ল"-এ আইন অধ্যয়ন করিতে ও আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে

থাকেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম কৃতিত্বের সহিত আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় গণিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বার-য়্যাট-ল শ্রেণীভুক্ত হন। ইতিমধ্যে আনন্দরাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি. ডিগ্রীও অর্জন করিয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থান কালে আনন্দরাম প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ থিয়োডোর গোল্ডষ্ট্যুকর, ম্যাক্স মুল্ল্যর প্রভৃতি পণ্ডিতদের প্রীতিভাজন হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আনন্দরাম স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও আসামের শিবসাগরে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কার্যে যোগদান করেন। আনন্দরামের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে আনন্দরামের পিতা জীবিত ছিলেন। আসামের মধ্যে আনন্দরামের পূর্বে বা পরে কেহই আই. সি. এস. হন নাই, অসমীয়া যুবকদের মধ্যে তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট ও ব্যারিস্টার হন। কৃতী পুত্রের সাফল্যে আনন্দরামের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যে বিশেষ হৃষ্ট হইয়াছিলেন ইহা বলাই বাহুল্য। আনন্দরামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরই তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন।

আসামে কিছুকাল চাকুরি করার পর আনন্দরাম বিশেষ চেষ্টা করিয়া বাঙ্গলাদেশে বদলী হইয়া আসেন; সম্ভবতঃ আসামের বাতাবরণ তাঁহার ভাল লাগে নাই। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবসাগর হইতে বদলী হইয়া আনন্দরাম মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করেন।

বাল্যাবধি আনন্দরাম সংস্কৃত ভাষার একান্ত অনুরাগী ছিলেন, ছাত্রাবস্থায় স্বদেশে ও বিদেশে সর্বদাই তিনি সংস্কৃত ভাষার চর্চা করিতেন—এই ভাবে তিনি সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। চাকুরিতে প্রবেশ করিয়া আনন্দরাম প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া সংস্কৃত মুদ্রিত পুঁথি সংগ্রহ করিতেন এবং রাজকার্যের অবসরে যতটুকু সময় পাইতেন তাহা অধ্যয়নেই ব্যয়িত করিতেন। কর্মে প্রবেশ

করিয়া তিনি একটি ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন আরম্ভ করেন, এই অভিধানটির প্রথম খণ্ড ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১] এই অভিধানটি প্রকাশিত হইলে উহা স্বদেশের ও বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃত হয়। একজন তরুণ বয়স্ক অথচ গুরুদায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা কিভাবে এইরূপ একটি অভিধান রচনা সম্ভব ইহা চিন্তা করিয়া সকলেই বিস্মিত হন। এই বৎসরই আনন্দরাম ভবভূতি রচিত "মহাবীর চরিতম্"-এর একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ নিজকৃত "জানকীরাম" ভাষ্য সহ প্রকাশ করেন।[২] আনন্দরাম তাঁহার পরলোকগত মধ্যমাগ্রজ জানকীরামের স্মৃতি স্মরণীয় রাখিবার জন্যই নিজকৃত ভাষ্যটির জানকীরাম ভাষ্য নামকরণ করেন। আনন্দরাম সম্পাদিত "মহাবীর চরিতম্" প্রকাশের পরই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উহা পাঠ্যরূপে মনোনীত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে আনন্দরাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ., ও বি. এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ প্রভৃতি হইতে পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশগুলির টীকা টিপ্পনী সহ সরল ব্যাখ্যা সনিবিষ্ট হইয়াছিল।[৩] এই পুস্তকটি সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। এই পুস্তকটি প্রকাশের পর আনন্দরাম কবি ভবভূতি ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার স্থান সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ প্রকাশ করেন।[৪] এই বৎসরই আনন্দরাম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সহ জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদে উন্নীত হন। এই সময়েই তাঁহার ইংরাজী সংস্কৃত অভিধানের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে আনন্দরাম তাঁহার রচিত একটি অভিনব সংস্কৃত ব্যাকরণ সংযোজিত করেন, ইহাতে সংস্কৃত ভাষার লিঙ্গ ও বাক্যবিন্যাস রীতি আলোচিত হয়, এই পুস্তকে সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে উৎকৃষ্ট উদ্ধৃতি ইংরাজী-অনুবাদ সহ

সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। মৌলিক সংস্কৃত রচনায় শিক্ষার্থী ও সাধারণ শিক্ষিতদের উৎসাহিত করার জন্যই সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহশীল আনন্দরাম এই পুস্তক রচনা করেন। পর বৎসর এই ব্যাকরণটি পৃথক পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম রচিত সংস্কৃত অভিধানের শেষ ৩য় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের ভূমিকাস্বরূপ আনন্দরাম প্রাচীন ভারতের ভূগোল বিষয়ে একটি অতি মূল্যবান গবেষণামূলক ইংরাজী নিবন্ধ সংযোজিত করেন। ইতিপূর্বে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ব্যতীত প্রাচীন ভারতের ভূগোল সম্বন্ধে কেহ আলোচনা করেন নাই। কানিংহামের আলোচনা প্রধানতঃ হিউএন চ্যাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছিল, আনন্দরামের আলোচনার কাল ও পরিসর আরও বিস্তৃত ছিল। আনন্দরামের অভিধানটি দেশে ও বিদেশে সকল সংস্কৃতানুরাগীরই প্রশংসা অর্জন করে। এই পুস্তক রচনার জন্য ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্স মুল্যার প্রভৃতি সুধিবৃন্দ আনন্দরামকে অভিনন্দিত করেন। বিশেষজ্ঞদের নিকট ইতিপূর্বে প্রকাশিত স্যার মনিয়ার উইলিয়মস্ রচিত ইংরাজী সংস্কৃত অভিধানটি অপেক্ষা আনন্দরামের অভিধান আরও উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম প্রতি খণ্ডে সহস্র পৃষ্ঠাযুক্ত দ্বাদশ খণ্ডে একটি সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার পরিকল্পনা করেন। তিনি স্থির করেন ইহাতে ব্যাকরণের নিয়মগুলি সরলীকৃত করা হইবে, এই নিয়মগুলির কালানুক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচিত হইবে, নিয়মগুলির উদাহরণ প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত হইবে এবং ইহাতে সমগ্র বেদেরও ভাষ্য করা হইবে। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে প্রথমে কিছুদিন সরকারী কর্ম হইতে ছুটি লইয়া আনন্দরাম কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতায় বাগবাজারে স্বীয় ভ্রাতার নামে একটি মুদ্রণালয় স্থাপন করেন ও একটি বাটী

ক্রয় করেন। এই সঙ্গে বহরমপুর শহরেও তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। পরিকল্পিত ব্যাকরণ প্রকাশের জন্যই তিনি দুইটি স্থানে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া প্রেস স্থাপন করেন এবং কর্মচারী রাখিয়া এইগুলি পরিচালনের ব্যবস্থা করেন। ইহার পর দীর্ঘদিনের ছুটি (ফার্লো) লইয়া আনন্দরাম তাঁহার ব্যাকরণ রচনার উপাদান সংগ্রহের জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, অক্সফোর্ডের বডলেয়ন লাইব্রেরি ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি হইতে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আনন্দরাম স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং চট্টগ্রামে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ ও কালেক্টররূপে সরকারী কার্যে যোগদান করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম পরিকল্পিত ব্যাকরণের দশম খণ্ডটিই প্রথমে প্রকাশিত হয়। 'ছন্দ' সম্পর্কীয় এই গ্রন্থে পিঙ্গলসূত্র শৌনক-ঋক্ প্রতিশাক্য, আগ্নেয় ছন্দসার, নারায়ণ ভট্ট টিকাসহ কেদারভট্ট রচিত বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি ছন্দশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি অতি পাণ্ডিত্য সহকারে ব্যাখ্যাত হয়। এই ব্যাখ্যানের সহিত ছন্দ সম্পর্কিত ১৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী ভূমিকাটিও এই খণ্ডের গৌরব বর্ধন করে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম বামন, বাগ্‌ভট্ ও ভোজরাজ প্রণীত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থত্রয় সম্পাদন করিয়া 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' নামে একত্র প্রকাশ করেন (৬)। পরবৎসর ভোজ রচিত সরস্বতী কণ্ঠাভরণ একক ভাবেও প্রকাশিত হয় (৭)। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম নোয়াখালির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ ও কালেক্টার পদে উন্নীত হন। ইহার পুর্বেও তিনি অস্থায়ীভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করেন। ভারতীয়দের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কার্য করিবার গৌরব আনন্দরামই প্রথমে লাভ করেন। আনন্দরামের অল্পকাল পর রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ও এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরামের সংস্কৃত ব্যাকরণের পরবর্তী খণ্ড তৃতীয় খণ্ডরূপে "নানার্থ সংগ্রহ" নামে ৫৩ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে অমরকোষ, বিশ্ব প্রকাশ (মহেশ্বর), হেমচন্দ্র, হলায়ুধ, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী, মাতৃকা-শেষ প্রভৃতি প্রচলিত ও অপ্রচলিত কোষ-গ্রন্থ হইতে শব্দের রূপান্তর দৃষ্টান্ত সহ পর্যালোচিত হয়। আনন্দরাম পরিকল্পিত দ্বাদশ খণ্ড ব্যাকরণের মধ্যে দুইটি খণ্ডই প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিকল্পিত অপর দশটি খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নিযুক্ত হন। এই সময় একজন প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ ও জ্ঞানসাধকরূপে তিনি সর্বত্রই স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দরাম নামলিঙ্গানুশাসন (৮) ও ধাতুবৃত্তিসার নামে দুইটি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (৯)। নামলিঙ্গানুশাসন গ্রন্থটিতে অমরসিংহ রচিত অমরকোষ ক্ষীরস্বামী ও বঙ্গীয় পণ্ডিত বৃহস্পতি রায়মুকুটের টীকা সহ সন্নিবিষ্ট হয়। ধাতুবৃত্তিসার গ্রন্থে দুর্গাসিংহ রচিত কাতন্ত্রগবৃত্তি রামনাথ রচিত মনোরমা ভাষ্য সহ মুদ্রিত হয়। পরবৎসর আনন্দরাম ধাতুপাঠ বা ধাতুকোষ নামে আর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, ইহাতে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত ভাষার সকল ধাতুর অর্থ দেওয়া হয়. প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণগুলির ধাতু-সম্বন্ধীয় অংশের সারাংশও এইগ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১০)।

আনন্দরাম কর্তৃক রচিত পুস্তকাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে তাঁহার সারস্বত সাধনার লক্ষ্য ছিল সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ ব্যাকরণের প্রচার। সংস্কৃতে আনন্দরামের যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাহা ব্যাকরণ, অভিধান ও অলঙ্কার শাস্ত্র চর্চায় মূলতঃ নিবদ্ধ ছিল। আনন্দরাম রচিত গ্রন্থাবলী বর্তমান যুগে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারে তাঁহার আজীবন সাধনা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তুলনীয়।

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষিগণ আনন্দরামের জ্ঞানচর্চাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। জ্ঞান-সাধনায় বিঘ্ন হইবে আশঙ্কা করিয়া আনন্দরাম দারপরিগ্রহ করেন নাই। গুরুতর রাজকার্যের দায়িত্ব এবং অবিশ্রান্ত অধ্যয়নের জন্য আনন্দরামের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর রূপে কর্মরত থাকা কালে আনন্দরাম পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিন মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী দানবীর তারকনাথ পালিত (পরে সার ও ডঃ) মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, দুই জনের এই বন্ধুত্ব উত্তরকালে আরও সুদৃঢ় হয়। গুরুতর রোগগ্রস্ত হইয়া আনন্দরাম চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসেন এবং তারক-নাথের বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারকনাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গ আনন্দরামের পরিচর্যায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আনন্দরামের চিকিৎসার জন্য কলিকাতার শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ও ডাক্তারদের নিযুক্ত করা হয়। সকল সেবাযত্ন ও চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি পরম সুহৃদ তারকনাথের আশ্রয়ে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে আনন্দরামের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। আনন্দরামের মৃত্যু সংবাদে সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতানু-রাগী বিদ্বজ্জন শোকমগ্ন হন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র হিন্দু-প্যাট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতিতে যথোচিত মর্যাদার সহিত আনন্দরামের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়। আনন্দরাম ষোল বৎসর ধরিয়া সরকারী কর্মচারীরূপে যে সকল স্থানে কার্য করিয়াছিলেন সেই সব স্থানের প্রজাবৃন্দ আনন্দরামের মৃত্যুতে নিরতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হন। আনন্দরাম শুধু দক্ষ শাসক ছিলেন না, সরকারের প্রতিনিধিরূপে তিনি সর্বদাই প্রজাদের মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট থাকিতেন, যেখানে যাইতেন সেইখানেই তিনি প্রজাদের জলকষ্ট

নিবারণ করিতেন এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি বিধান করিতেন। কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে তাঁহার চেষ্টায় বাজার, স্কুল, দীঘিকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইগুলি বরুয়া দীঘি, বরুয়া বাজার, স্কুল প্রভৃতি নামে খ্যাত হয়। বহু পণ্ডিতকে তিনি মাসিক বৃ‌ি দিয়া সাহায্য করিতেন, অধ্যয়নার্থী দুঃস্থ ছাত্র কখনও তাঁহার সাহায্য লাভ করিতে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইত না। বহু লোককে তিনি জীবিকাসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আনন্দরাম যখন সদর হইতে রাজকার্যে গ্রামাঞ্চলে যাইতেন তখন নিজ অর্থব্যয়ে তিনি সঙ্গে প্রচুর খাদ্য ও বস্ত্র লইয়া যাইতেন ও প্রকৃত দুঃস্থ ব্যক্তি দেখিলে তাহাদের ঐগুলি দান করিতেন। আনন্দরামের কর্মজীবন বাঙ্গালাদেশের ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, বগুড়া, বর্ধমান, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত হয়।

আনন্দরাম বাঙ্গালার নিকটতম প্রতিবেশী আসামের সন্তান। বাঙ্গলা তাঁহার মাতৃভাষা না হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত থাকার সময়ে তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষার (ডায়ালেক্টস) একটি শব্দকোষ বা অভিধান প্রণয়নের সঙ্কল্প করেন ও এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টের সহায়তা প্রার্থনা করেন। আনন্দরামের অকাল মৃত্যুতে এই সাধু সঙ্কল্পটি বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই।

আনন্দরামের মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় তদানীন্তন উপাচার্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দরামের মৃত্যুতে সাতিশয় খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক কবিতা রচনাতেও আনন্দরামের বিশেষ দক্ষতা ছিল। আমাদের দেশে আধুনিক কালে সংস্কৃত চর্চা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আনন্দরামের নাম

অগ্রগণ্য। আনন্দরামের অকাল মৃত্যু না হইলে তিনি সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডারে আরও বহু সম্পদ সংযুক্ত করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(১৮৫৩—১৯৩১)

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর (২২শে অগ্রহায়ণ, ১২৬০ বঙ্গাব্দ) চব্বিশপরগণা জেলার নৈহাটি শহরে একটি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারে হরপ্রসাদের জন্ম হয়। হরপ্রসাদের পিতার নাম রামকমল ন্যায়রত্ন। ইনি তাঁহার কৃতবিদ্য-পূর্বপুরুষদের ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ও তাঁহাদের পারিবারিক চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন।

হরপ্রসাদের পিতামহ শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার ও মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার তাঁহাদের জীবদ্দশায় পাণ্ডিত্যের জন্য সমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

হরপ্রসাদের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী নামক স্থানের এ্যাঙ্গলো বেঙ্গলী স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। নন্দকুমার পিতৃহীন চতুর্থ সহোদরকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া কান্দী স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেন। কান্দীর স্কুলেই হরপ্রসাদের ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কান্দী স্কুলে হরপ্রসাদ 'শরৎনাথ ভট্টাচার্য' নামে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকালে তিনি এই নামেই অভিহিত ছিলেন। পরবর্তী কালে কঠিন রোগমুক্তির পর তাঁহার নূতন নামকরণ হয় 'হরপ্রসাদ'। শিবের প্রসাদে রোগমুক্ত হইয়াছেন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাঁহার আত্মীয়গণ এই নতুন নামকরণ করেন। হরপ্রসাদের কান্দীর স্কুলে প্রবিষ্ট হওয়ার অল্পকাল পরেই নন্দকুমারেরও অকালমৃত্যু হয়। অগত্যা হরপ্রসাদ নৈহাটিতে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েকবৎসর কাঁটাল-পাড়ার টোলে ও স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, এই সূত্রে হরপ্রসাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে ছাত্রাবাসে আশ্রয় লাভ করেন। অর্থাভাব ও অন্যবিধ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিতে হইলেও হরপ্রসাদ ছাত্রাবস্থাতেই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দান করেন ও পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অনেকবার বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রী ও এই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন।

এম. এ. উপাধি লাভের পর হরপ্রসাদ কলিকাতা হেয়ার স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ লাভ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসরকাল তিনি এই পদে কার্য করেন। ইহার মধ্যে এক বৎসর কাল (১৮৭৮-৭৯) ছুটি লইয়া স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ যান এবং তত্রস্থ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। এই বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সহকারী সরকারী অনুবাদক নিযুক্ত হন। প্রায় তিন বৎসর এই পদে কার্য করার পর তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হরপ্রসাদ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ইহার পর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হরপ্রসাদ এই অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কর্ম হইতে

অবসর গ্রহণ করার পর গভর্নমেণ্ট মনস্বী হরপ্রসাদকে "Bureau of Information for the benefit of civil officers in Bengal in history, religion, customs and folklore of Bengal" নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে নির্বাচন করেন। অবসরকালে এই কার্যের জন্য হরপ্রসাদ মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাসিক ১০০ টাকার একটি বৃত্তি ভোগ করিতেন। এশিয়াটিক সোসাইটি মারফত এই বৃত্তি দেওয়া হইত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হরপ্রসাদকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত হরপ্রসাদ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাবত্তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক (Honoris causa) ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন।

হরপ্রসাদ যখন সংস্কৃত কলেজে বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন তিনি "ভারত মহিলা" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া মহারাজ হোলকার প্রদত্ত একটি পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আদর্শস্থানীয় মহিলাদের জীবনকাহিনী আলোচিত হয়। এই রচনাটি প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়া (১২৮২, মাঘ-চৈত্র), ১২৮৭ বঙ্গাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "ভারতমহিলা" প্রকাশ সূত্রে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচিত হন ও তাঁহার স্নেহলাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য বলিয়া পরিচয় দান করিতে গৌরব বোধ করিতেন। "ভারতমহিলা" প্রকাশের পর ১২৮২ হইতে ১২৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত হরপ্রসাদের ২৫টিরও অধিক রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদ রচিত "বাল্মীকির জয়" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়, ইতিপূর্বে ইহার কতকাংশ বঙ্গদর্শনেও প্রকাশিত হইয়াছিল। হরপ্রসাদ পরিণত জীবনে "কাঞ্চন

মালা” (১৩২২) ও “বেণের মেয়ে”, (১৩২৬) নামে দুইখানি ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস রচনা করেন—এই দুইখানি পুস্তক রচনা-শৈলী ও বিষয়বস্তু গুণে বাঙ্গলা সাহিত্যেয় অপূর্ব সম্পদ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে তিনি “মেঘদূত ব্যাখ্যা” নামে একটি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ প্রধানতঃ একজন সুপণ্ডিত গবেষক-রূপেই পরিচিত ছিলেন, তাঁহার প্রতিভার প্রধান পরিচয় তাঁহার গবেষণামূলক রচনাগুলিতেই নিবদ্ধ আছে। হরপ্রসাদের গবেষণা-ধর্মী রচনাগুলির কথা বাদ দিলেও বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার সৃজনধর্মী মৌলিক রচনাবলীরও অপরিসীম মূল্য আছে। বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ-শিল্পী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে হরপ্রসাদ এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার ও কৃতবিদ্য-সংস্কৃতজ্ঞ সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেন। সরকারী কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পদের দায়িত্ব অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াও হরপ্রসাদ তাঁহার দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-রূপে পরিগণিত হইতেন; তাঁহার নায়কত্বে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই বিশেষ উন্নতি হয়।

তরুণ-সংস্কৃতজ্ঞ হরপ্রসাদ শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন কর্ণধার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত পরিচিত হন। রাজেন্দ্রলাল এই সময় নেপাল হইতে আনীত সংস্কৃত-বৌদ্ধ পুঁথিসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি এই কার্যে হরপ্রসাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হরপ্রসাদ পরম নিষ্ঠার সহিত এই কার্যে তাঁহার সহায়তা করেন। রাজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে আসিয়াই হরপ্রসাদ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-চর্চায় আগ্রহান্বিত হন এবং এই সূত্রেই জীবনে সমধিক

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের আনুকূল্যে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই পদাধিকারীরূপে সোসাইটির "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সংস্কৃত পুস্তকগুলি প্রকাশের দায়িত্বভার হরপ্রসাদের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজীবনের জন্য তিনি সোসাইটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুইবার সোসাইটির সভাপতির পদেও বৃত হন (১৯১৯-২০, ১৯২০-২১)। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির "ফেলো" শ্রেণীভুক্ত হন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর সোসাইটি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদকে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ কার্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই কার্যের ভারপ্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে হরপ্রসাদের কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময় পুঁথি সংগ্রহ ও তাহাদের পরিচয় সমন্বিত তালিকা রচনাতেই ব্যয়িত হয়। পুঁথি সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত অধিকারীরূপে হরপ্রসাদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু দূরবর্তী অঞ্চল ভ্রমণ করেন ও অজস্র পুঁথি সংগ্রহ করেন। পুঁথি সংগ্রহ কার্যে তিনি চারিবার নেপাল রাজ্যে গমন করেন (১৮৯৭, ১৮৯৮-৯৯, ১৯০৭, ১৯২১) ও বহু দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্ত-পুঁথি সংগ্রহ করেন। শেষবার হরপ্রসাদ যখন নেপাল গমন করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল ৬৯ বৎসর। পুঁথি সংগ্রহকার্যে হরপ্রসাদের অদম্য নিষ্ঠা ও উৎসাহ ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। সোসাইটিতে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক দশ খণ্ডে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয় (১৮৭০-৮০)। রাজেন্দ্রলাল দশম খণ্ডটির দ্বিতীয়ভাগ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। হরপ্রসাদ প্রথম-পর্যায়ের দশম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করেন, ইহাতে ১০২৫টি পুঁথির বিবরণ ছিল, এতদ্‌ব্যতীত তিনি এই দশ খণ্ড বিবরণীর একটি সূচী আর একটি খণ্ডে প্রকাশ করেন (১ক)। এই গ্রন্থমালার নবপর্যায়ের চারিটি খণ্ডে তিনি ১৪৭৩টি পুঁথির

বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন (১ খ)। পুঁথি সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত হইয়া হরপ্রসাদ এই বিষয়ে কয়েক খণ্ড প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রকাশ করেন (২)। নেপাল ভ্রমণে গিয়া হরপ্রসাদ নেপাল রাজপরিবারের পাঠাগারে রক্ষিত তালপত্র ও অন্যবিধ কাগজে লিখিত ১৩৮৮টি গ্রন্থের তালিকাও সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (৩)। এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য পুঁথি-সংগ্রহ, পুঁথি-প্রাপ্তির প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াই হরপ্রসাদ ক্ষান্ত হন নাই। আজীবন পরিশ্রম করিয়া হরপ্রসাদ এইগুলিকে বিষয়ানুযায়ী বিন্যস্ত করেন এবং ১৪টি সুবৃহৎ খণ্ডে ১৪৬৮৬ পুঁথির বিবরণ সঙ্কলন ও লিপিবদ্ধ করেন। হরপ্রসাদের জীবদ্দশায় এই বিস্তৃত বিবরণীর ছয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদের দেহান্তের পর এই বিবরণীর বাকী খণ্ডগুলি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক বিভিন্ন পণ্ডিতের সম্পাদনায় বিভিন্ন সময়ে হরপ্রসাদের নামেই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। চতুর্দশ ও শেষতম খণ্ডটি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যবর্তী দ্বাদশতম খণ্ডটি (আয়ুর্বেদ পুঁথি সমূহের বিবরণ) প্রকাশিত হইলেই হরপ্রসাদ আরব্ধ এই বিস্তৃত পুঁথি বিবরণী প্রকাশ সম্পূর্ণ হইবে (৪)। সোসাইটির জন্য ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হরপ্রসাদ আট হাজারেরও অধিক পুঁথি সংগ্রহ করেন। বৌদ্ধ-সাহিত্য, বৈদিক-সাহিত্য, স্মৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, তন্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই পুঁথিগুলি লিখিত। এমন কি ক্রীড়াকৌতুক ও পক্ষী-শিকার বিষয়েরও পুঁথি হরপ্রসাদের চেষ্টায় সংগৃহীত হয়। হরপ্রসাদের সংগৃহীত পুঁথিগুলি ও তাঁহার দ্বারা সঙ্কলিত পুঁথি-তালিকা, বিবরণ প্রভৃতি সংস্কৃত বাঙ্ময়ের ইতিহাস রচনায় অতি মূল্যবান উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই বিস্তৃত পুঁথি তালিকার (ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ্‌ ক্যাটালগ) কয়েকটি খণ্ডে হরপ্রসাদের স্বলিখিত বহু পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য পুস্তক সংগ্রহ ব্যতীত হরপ্রসাদ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ও বডলেয়ন লাইব্রেরির জন্যও বহু দুর্লভ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেন।

সোসাইটির জন্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াই হরপ্রসাদের উৎসাহ ক্ষান্ত হয় নাই, এই পুঁথিগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তিনি সম্যক্ জ্ঞান আহরণ করেন ও এই জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়া বহু মৌলিক তথ্য প্রচার করেন।

হরপ্রসাদ নিজের আবিষ্কৃত অনেকগুলি দুর্লভ ও অপ্রকাশিতপূর্ব গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (৫-১৩)। এইগুলির অধিকাংশই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলির মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত কাব্যটি শুধু সংস্কৃত-কাব্য হিসাবেই নহে, প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস ও সমাজ-সমীক্ষা হিসাবেও উল্লেখ-যোগ্য। "সৌন্দরানন্দ" কাব্যটি কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি অশ্বঘোষের রচনা, এই কাব্যের নায়ক নন্দ ভগবান বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সুন্দরী স্ত্রীর মোহজাল ছিন্ন করিয়া নন্দ কর্তৃক বুদ্ধের শরণ গ্রহণের আখ্যায়িকা এই মনোহর-কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। "চতুঃশতিকা" বৌদ্ধদর্শনের প্রাচীন পুঁথি। "অদ্বয় বজ্র সংগ্রহ" পুস্তকে বৌদ্ধদর্শন বিশেষতঃ বজ্রযান মতবাদ ২১টি নিবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "বল্লাল চরিত" গ্রন্থটি আনন্দভট্ট কর্তৃক সেনরাজ বল্লালসেনের রাজত্বকালের ৩০০ শত বৎসর পরে লিখিত হয়—এই বইটিতে বাঙ্গলার সেনরাজ যুগের ইতিহাস পাওয়া যায়। শৌনিকশাস্ত্র গ্রন্থটির ৭টি অধ্যায়ে শ্যেনপক্ষী (বাজ) শিকারপদ্ধতি ও শ্যেনপক্ষীর বিবরণ আছে।

নেপাল হইতে হরপ্রসাদ সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম সুভাষিত সংগ্রহের একটি খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করেন, এই পুঁথিটির আখ্যাপত্র ও পুষ্পিকা না থাকায় ইহার নাম বা সঙ্কলন কর্তার নাম জানা যায় নাই। হরপ্রসাদ তাঁহার বিপুল-পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার

বলে সিদ্ধান্ত করেন যে এই সংগ্রহটি দশম শতাব্দীর সঙ্কলন, এবং ইহার লিপি বঙ্গাক্ষরের আদিরূপ, সুতরাং ইহার সঙ্কলনস্থানও বঙ্গদেশ। নাম না থাকায় তিনি এই পুস্তকের নাম দেন "কবীন্দ্র-বচন সমুচ্চয়।" ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ইংরাজ ভারত-বিদ্-পণ্ডিত ফ্রেড্রিথ উইলিয়ম টমাস পুস্তকটি এই নামেই সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা নং ২০৮, ১৯১২)। দীর্ঘকাল পরে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পুঁথির 'কপি' তিব্বত ও নেপাল হইতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের অধ্যাপক গোখলে ও ডঃ কোশাম্বী সম্পূর্ণ গ্রন্থটি "সুভাষিতরত্নকোষ" নামে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (হারভার্ড ওরিয়েণ্টেল সিরিজ নং ৪২, ১৯৫৭), এই গ্রন্থের ডঃ ড্যানিয়েল ইঙ্গালস্ কৃত ইংরাজী অনুবাদ এই সিরিজের ৪৪ সংখ্যক পুস্তকরূপে সম্প্রতি (১৯৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুঁথির আখ্যা-পত্র ও পুষ্পিকা ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে সংস্কৃত-ভাষার এই আদিতম সুভাষিত সংগ্রহটি পাল-রাজ-যুগে উত্তর বঙ্গের (বরেন্দ্রভূমি) জগদ্দলমহাবিহারের অধিবাসী বিদ্যাকর নামক পণ্ডিতদ্বারা এই বিহারেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। "সুভাষিত-রত্নকোষ" সংগ্রহ বাঙ্গালীর কীর্তি এবং ইহার লিপি প্রাচীন বঙ্গলিপিরই একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। স্বল্পপ্রমাণের ভিত্তিতে সহজাত প্রতিভাবলে হরপ্রসাদ এই সংগ্রহ সম্বন্ধে যে প্রাথমিক মত প্রকাশ করেন—সুভাষিত রত্নকোষের সুবিজ্ঞসম্পাদকত্রয় অধ্যাপক গোখলে, ডঃ কোশাম্বী ও মার্কিন অধ্যাপক ডঃ ইঙ্গালস্ তাহা সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত বুদ্ধস্বামী রচিত "বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ" নামক বহুমূল্যবান গ্রন্থটিও ফরাসী পণ্ডিত ল্যাকোটে ও লুই রেণু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল (Paris 1908-29)।

একদিকে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মক্ষেত্রে হরপ্রসাদ যেমন সংস্কৃত-সাহিত্যের বহু দুর্লভ-রত্ন আবিষ্কার করেন এবং ভারতীয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানামুখী সার্থক-গবেষণা সম্পন্ন করেন অন্যদিকে তিনি তেমনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত-ইতিহাসকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া যান। ভাষাচার্য স্নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরপ্রসাদের এই সাধনাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের "নষ্ট কোষ্ঠী" উদ্ধার কার্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (ভূমিকা—হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, কলিকাতা, ১৩৬৩)।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল (১৩০১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বৎসর পর হরপ্রসাদ ইহার সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হন। অতঃপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল। বহু বর্ষ যাবৎ তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি (১৩০৪-১৩০৯, ১৩১৮-১৩১৯, ১৩২৩-১৩২৬, ১৩৩১, ১৩৩৭-৩৮) ও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন (১৩২০-২২, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২-৩৬)। এতদ্‌ব্যতীত পরিষৎ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০৯) তাঁহাকে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। এইটি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মান।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল ভ্রমণে গিয়া হরপ্রসাদ সংস্কৃতেতর ভাষায় লিখিত কয়েকটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি প্রসাদাৎ হরপ্রসাদ অপভ্রংশে লিখিত এই রচনাগুলিকে বাঙ্গলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে চিনিতে পারেন। এই পুঁথিগুলির মধ্যে ছিল সংস্কৃত টীকা সহ চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়, সরোরুহবজ্র রচিত দোহাকোষ ও কাহ্নপাদ রচিত দোহাকোষ ও ডাকার্ণব। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই চারিখানি পুস্তক তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয় (১৪)। ডঃ স্নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শহীদুল্লা, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি ভাষাবিদ্‌গণের অক্লান্ত গবেষণায় "বৌদ্ধগান ও দোহার" অন্তর্ভুক্ত "চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়"-এর ৪৭টি পদযুক্ত পুঁথির ভাষা ও অক্ষর

অভ্রান্তরূপে বাঙ্গলা বলিয়া প্রমাণিত হয়। শুধু তাহাই নহে, এই ৪৭টি পদের ২৪ জন পদকর্তাও বাঙ্গালী বলিয়া নির্দিষ্ট হন। 'এই পদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সাধকদের রচিত সাধন-সঙ্কেতমূলক গানের সমষ্টি।। দুর্বোধ্য বিধায় বোধ সৌকর্যার্থে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে এইগুলির সংস্কৃত টীকা রচনা করা হইয়াছিল। "বৌদ্ধগান ও দোহা" সম্বন্ধে হরপ্রসাদের প্রজ্ঞা-লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার সমসাময়িক বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিতগণ কর্তৃক সাধারণভাবে সমর্থিত হইয়াছে। চর্যাচর্য-বিনিশ্চয় বর্তমানে 'চর্যাপদ' নামে খ্যাত হইয়াছে। হরপ্রসাদ এই মত প্রকাশ করেন যে পদগুলি ১০ম শতাব্দীতে রচিত, কারণ ইহার অন্যতম পদকর্তা লুইপা বা লুইপাদ অতীশ দীপঙ্কর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ডঃ শহীদুল্লা চর্যাপদগুলি আরও প্রাচীন অর্থাৎ ৭ম হইতে ৮ম শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে করেন, ইনি স্বয়ং চর্যাপদের একটি উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুনীতিকুমার ও প্রবোধচন্দ্র চর্যাপদের রচনাকাল ১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া মনে করেন। প্রবোধচন্দ্র পরবর্তীকালে তিব্বতীয় অনুবাদের সহিত তুলনামূলক আলোচনান্তে চর্যাপদের নির্ভুল পাঠ স্থির করিয়া দিয়াছেন (Journal of the Dept. of Letters, Cal. Univ., Vol XXX, 1938)। চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ের সহিত "বৌদ্ধ গান ও দোহা"-য় প্রকাশিত অন্যান্য পুঁথিগুলির ভাষা বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পশ্চিমা অপভ্রংশ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এইগুলি যে বাঙ্গলা তাহা অবশ্য প্রমাণিত হয় নাই। যাহাই হউক হরপ্রসাদ কর্তৃক চর্যাপদ (চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়) আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গলা ভাষার বয়স যে অন্ততঃ সহস্র বৎসর ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রই বর্তমানে আজ এই বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারে যে তাহার মাতৃভাষা সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যপূর্ণ। মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালীর এই অধিকার হরপ্রসাদের সাধনার দান। ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার "বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে চর্যাপদ

সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে "শুধু বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের নয় তাবৎ নবীন-আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া এই পদগুলি অমূল্য।" (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, চতুর্থ সং, পৃঃ ৬৪)

শাস্ত্রী মহাশয় যেমন বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনত্ব প্রমাণও তেমনি তাঁহার কীর্তি। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে পুঁথি সন্ধান করিতে গিয়া হরপ্রসাদ অনেক অজ্ঞাত প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথিরও সন্ধান পান ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সব বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথির বিবরণ তাঁহার "ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ ক্যাটালগ"-এর ৯ম খণ্ডে সঙ্কলিত আছে। বাঙ্গলায় মুসলমান অধিকার কালের পূর্বে বাঙ্গলা ভাষায় অথবা বঙ্গাক্ষরে লিখিত কোন পুঁথি হরপ্রসাদের পূর্বে কেহ আবিষ্কার করেন নাই। বঙ্গাক্ষর যে অন্ততঃ দশম শতাব্দী হইতে প্রচলিত ছিল চর্যাপদ ব্যতীত নিজ আবিষ্কৃত অপর দশখানি সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি হইতে হরপ্রসাদ তাহা প্রমাণ করেন। বঙ্গাক্ষরে দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লিপিকৃত এই পুঁথিগুলির নাম ঃ—কালচক্রযান, ঐ টীকা, ক্ষণভঙ্গ-সিদ্ধি, বজ্রাবলী, কুট্টনীমত, হেবজ্ররত্ন, রামচরিত, ঐ টীকা, দোহাকোষ-পঞ্জী, অদ্বয় বজ্র ও অপোহসিদ্ধি। এই পুঁথিগুলির কোন কোনটি বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবিষ্কৃত হয় এবং বাঙ্গলা-দেশেই যে এইগুলি লিপিবদ্ধ হয় তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাঙ্গলাদেশে এক সময়ে মহাযান-বৌদ্ধ-ধর্ম যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুঁথি ও অন্যান্য সূত্র হইতে হরপ্রসাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। বঙ্গদেশের বিশাল সংখ্যক নরনারী যে এককালে বৌদ্ধ ছিল এবং বঙ্গের নিম্নবর্ণের মধ্যে ধর্মদেবতার পূজার মধ্য দিয়া তাহা এখনও যে প্রবহমান সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ও নারায়ণ পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া হরপ্রসাদ ইহা প্রতিপন্ন করেন। এই বিষয়ে তিনি একটি

ইংরাজী পুস্তিকাও রচনা করেন (১৫)। রমাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজা সম্বন্ধীয় "শূণ্য-পুরাণ" নামক অতি প্রাচীন পুঁথিটিও হরপ্রসাদের আবিষ্কার। ইহা নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয় (সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী, ১৩১৪)। "চর্যাপদ" প্রকাশের পূর্বে এইটিই বঙ্গভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে পরিগণিত ছিল।

এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালা সম্পাদনায় হরপ্রসাদ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতেও কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনেও তাঁহার সেই নৈপুণ্য ও মনীষা পরিদৃষ্ট হয়। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ "প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী" নামে একটি দ্বৈমাসিক-পত্রের প্রবর্তন করেন, হরপ্রসাদ ইহা সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ইহার ১১টি সংখ্যা সম্পাদন করেন (১৯০১-২)। এই পত্রের প্রথম সংখ্যায় তিনি নেপাল হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাপতি রচিত অপূর্বপ্রকাশিত ১৮টি পদ প্রকাশ করেন (১৬)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে তিনি মাণিক গাঙ্গুলি কৃত ধর্মমঙ্গল ও কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১৭, ১৮)। কাশীদাসী মহাভারতের প্রাচীনতম পুঁথি অবলম্বনে শেষোক্ত গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণ ব্যতীত শাস্ত্রীমহাশয় পরিষদে আরও কতকগুলি বক্তৃতা দান করেন। এইগুলির নাম—বাঙ্গালার লিপিকথা (২৭শে চৈত্র ১৩২৬; ১০ই বৈশাখ ১৩২৭), মহাদেব (২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮, পরিষৎ পত্রিকায় ২৮ বর্ষে প্রকাশিত), "ব্রাত্য কাহাকে বলে" (৪ কার্তিক, ১৩২৯), জয়দেব ও চণ্ডীদাস (১৫ পৌষ, ১৩২৯), বিদ্যাপতি (২৯ ভাদ্র, ১৩৩০), ও বৌদ্ধধর্ম (৬ ও ১৩ চৈত্র, ১৩২২, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩)। পরিষৎ পত্রিকায় হরপ্রসাদ রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এইগুলির নামও উল্লেখযোগ্য—রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল

(৪র্থ বর্ষ, ১৩০৪) ; ধোয়ী কবির পবনদূত (৫ম বর্ষ) ; কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন পিত্তল ফলক (৪র্থ বর্ষ) ; বাঙ্গলা ব্যাকরণ (৮ম বর্ষ) ; বৌদ্ধ ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট (১৭ বর্ষ) ; হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা, সভাপতির অভিভাষণ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে (বর্ধমান) মূল সভাপতি ও সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন (২১ বর্ষ) ; সম্বোধন (২৩ বর্ষ). চণ্ডীদাস (২৬ বর্ষ) ; বাঙ্গলার পুরাণ অক্ষর (২৭ বর্ষ) ; চণ্ডীদাস (২৯ বর্ষ) ; হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ (৩১ বর্ষ), আমাদের ইতিহাস (৩২ বর্ষ) ; বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন (৩৩ বর্ষ), ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত (সভাপতির অভিভাষণ, ৩৫ বর্ষ) ; বাঙ্গলার বৌদ্ধ-সমাজ (সভাপতির অভিভাষণ, ৩৬ বর্ষ), সভাপতির অভিভাষণ (৩৭ বর্ষ) ; কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, চিরঞ্জীব শর্মা (৩৭ বর্ষ) ; বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বৃহস্পতি রায়মুকুট; রত্নাকর শান্তি ও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (৩৮ বর্ষ) ।

হরপ্রসাদ বাঙ্গলাভাষার প্রাচীনতম পুস্তক আবিষ্কার করিয়া যে কৃতিত্ব দেখান মৈথিল ভাষার "নষ্টকোষ্ঠী" উদ্ধারেও তাঁহার সেই কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর রচিত "বর্ণরত্নাকর" নামে একটি কথকতার পুঁথি তাঁহার দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হয়। মৈথিল ভাষায় এ যাবৎ প্রাপ্ত পুঁথির মধ্যে প্রাচীনতম এই পুস্তকটি পণ্ডিত বাবুয়া মিশ্র ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ভূমিকা ও শব্দ সূচী সহ এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত "কীর্ত্তিলতা" নামক নিজ আবিষ্কৃত ইতিহাস ও আখ্যানমূলক পুঁথিটিও সম্পাদন করিয়া বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন (১৯)।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসাদ

ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাস, জীবন-চর্যা, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার, বৌদ্ধসাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে Calcutta Review, Dacca Review, Indian Antiquary, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Journal of the Buddhist Text and Research Society, Indian Historical Quarterly, Epigraphica Indica প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরাজী ভাষায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। Asiatic Society-র পত্রিকায় (Journal) ও কার্যবিবরণীতে (Proceedings)-এ তাঁহার পঞ্চাশটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (দ্রঃ Index to Publications of Asiatic Society, Vol I, Part I, pp. 271-2 : Part II, pp. 441-43)।

বাঙ্গলা ভাষায় হরপ্রসাদের মৌলিক পুস্তক ও পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বিভা, কল্পনা, নারায়ণ (৪৭টি), প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, ভারতী, পঞ্চপুষ্প, সাহিত্য, মানসী-মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকাতেও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। হরপ্রসাদের বাঙ্গলা প্রবন্ধগুলির অনেকগুলির বিষয়বস্তু ছিল কালিদাস ও তাঁহার রচিত সাহিত্য। অসাধারণ রসবোধ ও পাণ্ডিত্যের সংযোগে কালিদাস সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া হরপ্রসাদ বাঙ্গালী পাঠককে কালিদাস-প্রীতি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেন।

জীবদ্দশায় হরপ্রসাদের অসাধারণ মনীষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে দেশবাসী কুণ্ঠিত হন নাই। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" ও সেনট্র্যাল টেক্সটবুক কমিটির সদস্য মনোনীত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের উপযুক্ত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার "বুদ্ধিস্ট টেক্সট এণ্ড রিসার্চ সোসাইটি"র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট পাণ্ডিত্যের

স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সি. আই. ই উপাধি লাভ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে বুদ্ধগয়ার মন্দির সংক্রান্ত কমিশনের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্টের অনুরোধে তিনি রাজস্থানের চারণ কবিদের গাথা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৪ ও ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম (বর্দ্ধমান) ও পঞ্চদশ (রাধানগর) অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনেও তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তিনি বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই ভাদ্র "তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনের স্মারকরূপে পরিষদের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বহু বিদ্বজ্জন লিখিত ভারততত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ—'হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখ-মালা'র প্রথম খণ্ড ও অমুদ্রিত ২য় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি কারুকার্য খচিত একখানি রৌপ্য পাত্রে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শাস্ত্রীমহাশয়কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করেন ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে শুদ্ধ খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপহার দেন" (দ্রঃ—সাহিত্য সাধক চরিত মালা, নং৭৩, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৬)। হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পাদন করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের পরিশিষ্টে হরপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাঙ্গলা লেখপঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত-

প্রাচ্য-বিদ্যা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ লাহোরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। (দ্রষ্টব্য :—Proceedings of All India Oriental Conference, 2nd and 5th Sessions, 1922 and 1928.)। শেষোক্ত অধিবেশনে তাঁহার ভাষণের বিষয় ছিল—আধুনিক ভারতে সংস্কৃত (দ্র :—প্রবুদ্ধ ভারত, ৩০শ খণ্ড, ১৯২৯)।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ মথুরায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় সংস্কৃত সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আহুত নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহির্ভারতে ভারত সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য "গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি" নামে কলিকাতায় যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ তাহার সভাপতির পদে বৃত হন।

হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর "ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলি" পত্রিকার ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যাটি (Vol IX, No. 1) তাঁহার নামেই উৎসর্গীকৃত হয়। এই সংখ্যাটিতে তাঁহার লিখিত মোট ৩২১টি ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক, পুস্তিকা, ও প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ হরপ্রসাদের বহু বিক্ষিপ্ত রচনা এই তালিকার মধ্যে ধরা পড়ে নাই। হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার কতকগুলি বিক্ষিপ্ত রচনা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করা হয়, হরপ্রসাদের এই রচনাগুলি এবং কয়েকটি ইংরাজী পুস্তিকা ও পাঠ্য পুস্তকের নামও পাদটীকায় প্রদত্ত হইল (২০—২৯)। হরপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার অন্যতম শিষ্য ও কৃতী পণ্ডিত ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন "তিনি কেবল প্রাচ্যবিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডারী ছিলেন না, এই বিদ্যার আহরণে ও সদ্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন। বৌদ্ধ ও সংস্কৃত-

সাহিত্যের অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ সম্পাদন এবং বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহু দর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির বহু সহস্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।...প্রাচীন লিপি ও শিলা-লেখ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় "এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা" প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ পত্রিকায় পাওয়া যাইবে। পথিকৃৎ হিসাবে এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত পণ্ডিত সমাজে এই জ্ঞানতপস্বীর মর্যাদা কোন কালে ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। পশ্চিম ভারতে যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, পূর্ব ও উত্তর ভারতে তেমনি হরপ্রসাদ আধুনিক গবেষণার মূল পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলিয়াছেন—"He, of all people, has been the real father of Oriental Research in Northern India" (দ্রঃ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৫)।

হরপ্রসাদ অতিশয় উদার হৃদয়, সরল ও স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্যও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। বন্ধু-বান্ধব ও শিষ্য-সতীর্থদের তিনি নানারূপ সুখাদ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইতে ভালবাসিতেন, এই গুণটি তাঁহার গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও ছিল। পরোপকারও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। অধ্যাপক ও সাহিত্য-জীবনের শিষ্যদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও সাহিত্য পরিষদের কর্মক্ষেত্রে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে বহু স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আলাপ আলোচনায় তাঁহার বৈদগ্ধ্য ও রসিকতা বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। হরপ্রসাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সুলভ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর, ১৯৩১) রাত্রি এগারোটার সময় হরপ্রসাদ অকস্মাৎ তাঁহার কলিকাতা পটলডাঙ্গা-পল্লীস্থ ভবনে পরলোক গমন করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সাধ্বী পত্নী হেমন্তকুমারীর মৃত্যু হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় ২৩ বৎসর কাল বিপত্নীক জীবন যাপন করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঁচপুত্র ও তিনটি কন্যা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও ভারত বিদ্যাচর্চা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। [১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি বিনয়তোষের জন্ম হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিনয়তোষ কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা মূলক নিবন্ধ রচনা করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ.-ডি. উপাধি লাভ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিনয়তোষ বরোদা রাজ্যের সংস্কৃত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও "গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টেল সিরিজ" নামীয় গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক পদে যোগদান করেন। বিনয়তোষের কর্মনৈপুণ্যে এবং বরোদা রাজ তৃতীয় সয়াজী রাও গাইকোয়াড়ের বদান্যতায় এই সংস্কৃত গ্রন্থাগারটি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়। গাইকোয়াড় গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে বিনয়তোষ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার অবসর গ্রহণকাল পর্যন্ত ৮০টি দুর্লভ সংস্কৃতগ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন।

বিনয়তোষের বিদ্যাবত্তায় প্রীত হইয়া বরোদা রাজ তাঁহাকে "রাজ্যরত্ন" এবং "জ্ঞানজ্যোতি" উপাধিতে ভূষিত করেন। বিনয়তোষ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায় দুইশতটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—
Elements of Indian Buddhist Iconography (1924, 1958), An Introduction to Buddhist Esoterism (1932), Saddhan Mala 2 Vols (1925, 1928), Guhya Samaj

Tantra (1931); Two Vajrayana Works (1929), Nispanna-yogavali (1949), Saktisangama Tantra, 3 Vols, (1932, 1941, 1947), বৌদ্ধ দেব-দেবী—বিশ্বভারতী।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন বিনয়তোষ নৈহাটিস্থ পিতৃ-পুরুষের বাসভবনে পরলোক গমন করেন।]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কবিগুরুকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠিতম জন্ম দিবস উপলক্ষে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তাহাতে পরিষদের সভাপতিরূপে হরপ্রসাদ একটি হৃদয়গ্রাহী আশীর্বচন পাঠ করেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ পূর্তির উৎসব (রবীন্দ্র-জয়ন্তী) পরিকল্পনায় হরপ্রসাদ স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি "রবীন্দ্র-জয়ন্তী পরিষদের" সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের (২৫শে ডিসেম্বর) অল্পদিন পূর্বে হরপ্রসাদ পরলোক গমন করায় জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মানপত্র পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন।

হরপ্রসাদের সাহিত্য কৃতির যথার্থ মূল্যায়নে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর পর বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত মন্তব্যটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য···"হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কার-মুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে চেয়েছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোন দিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,—অধিকাংশ স্থলেই আমরা

কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শন শক্তি।

"যে কোন বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট করে দেখেছেন ও সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ করে তোলা ধীশক্তির কাজ। এই জিনিসটি বড়ো বিরল। তবু, জ্ঞানের বিষয় প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করার যে পাণ্ডিত্য তার জন্যও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন; আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিধির গুণে সেই নিষ্ঠার চর্চাও শিথিল।...অল্প জানাকে তুমুল করে ঘোষণা করা এখন সহজ হয়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্‌কা হয়ে উঠ্‌ল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল সেইটের অভাব ঘটেছে।

"আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য পরিষৎকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি, কোনো মতে মনে করতে পারিনে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেইজন্যে যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক্, দেশ অকাল মৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক-নির্বাণের মুহূর্তে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন সেই আসনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে গেলেন এবং অতীত কালকে যিনি

ধন্য করেছেন ভাবীকালকেও তিনি অলক্ষ্য ভাবে চরিতার্থ করবেন।"...[হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা দ্বিতীয় ভাগ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) হইতে উদ্ধৃত]

(১) (ক) Notices of Sansk. Mss.—1st Series, Vol. X, Vol. XI (1870-1895)

(খ) „ „ 2nd Series, Vols. I—IV (1898-1911)

(২) (ক) Report on the Search of Sansk. Mss. for 1895-1900 (1901)

(খ) „ „ „ for 1901-1902 to 1905-06 (1905)

(গ) „ „ „ for 1906-07 to 1910-11 (1911)

(ঘ) Preliminary Report on the operation in search of mss. of Bardic Chronicles—1913

(ঙ) Report on a tour in Western India in search of mss. of Bardic Chronicles—1913.

(৩) A Catalogue of palm leaf mss. and selected paper mss. belonging to the Darbar Library of Nepal (2 Vols), 1905-1915

(৪) Descriptive Catalogue of the Sansk. Mss. in the Govt. collections under the care of Asiatic Society :—Vol. 1 : Budhist Mss. (1917), Vol. 2. Veda (1923); Vol. 3 :—Smriti 1923, Vol. 4 :— History and Geography (1923) ; Vol. 5 :—Purana (1928), Vol. 6 :— Vyakarana (1931), Vol. 7 :—Kavya (1934); Vol. 8 :—Tantra (2 Parts) 1939-40 ; Vol. 9 :—Vernacular (Parts I & II)—1941, Vol. 10 :—Jyotisa (2 Parts) 1945-48 ; Vol. 11 :—Philosophy, 1957, Vol. 13 :—Jaina Mss. Part I, 1951, Part II-Jaina Mss, 1966. Vol. 14 :— Miscellaneous, 1955

(৫) বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (Bibliotheca Indica No. 120) 1888-1897

(৬) বৃহৎস্বয়ম্ভু পুরাণ „ „ 133), 1894-1900

(৭) আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লাল-চরিত „ „ 164), 1904

(৮) Six Buddhist Nyaya Tracts „ 185), 1910

(৯) সৌন্দরানন্দ—অশ্ব ঘোষ „ 192), 1910

(১০) শৌনিক শাস্ত্র „ 193), 1910

(১১) রাম চরিত (সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত) (Memoirs of Asiatic Society, Vol. III, No. I) 1910

(১২) চতুঃ শতিকা (আর্যদেব) „ „ Vol. III, 1914

(১৩) অদ্বয় বজ্র সংগ্রহ (Gaekwad's Oriental Series No. 40), 1927

(১৪) হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, পরিষৎ গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৫৫, কলিকাতা, প্রথম সং শ্রাবণ ১৩২৩ ; নূতন সং অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

(১৫) Discovery of Living Budhism in Bengal, Calcutta, 1897

(১৬) প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯০৮

(১৭) শ্রীধর্মমঙ্গল (পরিষৎ গ্রন্থাবলী নং ৮), ১৩১২

(১৮) মহাভারত (আদিপর্ব)—কাশীদাস, পরিষৎ গ্রন্থাবলী ৭৫, ১৩৩৫

(১৯) কীর্তিলতা, হৃষীকেশ সিরিজ, কলিকাতা, ১৩৩১

(২০) প্রাচীন বাঙ্গলার গৌরব, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৪৬

(২১) বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধ সঙ্কলন), কলিকাতা, ১৩৪৮

(২২) ভারতবর্ষের ইতিহাস (পাঠ্য পুস্তক)—কলিকাতা, ১৮৯৫

(২৩) Vernacular Literature of Bengal before Introduction of English Education (16 P.)—1891

(২৪) The Study of Sanskrit, 1897

(২৫) The educative influence of Sanskrit, 1916

(২৬) Bird's-eye view of Sanskrit Literature 1917

(২৭) Magadhan Literature (Six lectures delivered at the Patna Univ. 1920-21)

(২৮) Lokayata, Univ. Bulletin No : 1, Dacca, 1925

(২৯) Absorption of the Vratyas, Univ. Bulletin No : 6, Dacca, 1926

(৩০) History of India (Text Book), Calcutta, 1895

মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী

(খ্রীঃ ১৮৬০—১৯২৬)

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাদ্রাজ রাজ্যের তিনিভেলী জেলার তারুবৈ নামক গ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তারুবৈ অগ্রহরম্ গণপতির জন্ম হয়। গণপতির পিতা রামসুব্বিয়র খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অশেষ শাস্ত্রবেত্তা ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা অপ্পয় দীক্ষিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

উপনয়ন সংস্কারের পর ৮ম হইতে ১২শ বর্ষ বয়সের মধ্যেই গণপতি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সমগ্র যজুর্বেদ পাঠ সম্পন্ন করেন। কৈশোর অতিক্রান্ত হইলে গণপতি আরও উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত তদানীন্তন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম্ নগরে (বর্তমানে কেরল রাজ্যের রাজধানী) আগমন করেন এবং সুব্বা দীক্ষিতার ও ধর্মাধিকারী কর্মনাই সুব্রাহ্মণ্য নামক দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই গণপতি অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন ও পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধি পান। ১৭ বৎসর বয়সে গণপতি "মাধবী-বসন্তম্" নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বিশাখম্ তিরুমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ গণপতিকে ত্রিবেন্দ্রমস্থ রাজকীয় প্রাসাদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজার আনুকূল্যে ত্রিবেন্দ্রমে একটি সংস্কৃত মহা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, গণপতি এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে গণপতি কয়েকটি

সংস্কৃত কবিতা ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। দশ বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজে প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য করার পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গণপতি এই কলেজের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ত্রিবেন্দ্রমে একটি সরকারী পুঁথি সংগ্রহশালা (ওরিয়েণ্টেল ম্যানস্‌ক্রিপ্ট লাইব্রেরি) স্থাপন করেন। নানাস্থান হইতে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এইগুলি পুঁথিশালায় রক্ষা করা এবং নির্বাচিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলি মুদ্রিত করাই ছিল এই পুঁথিশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ", বারাণসীর ভিজিয়ানাগ্রাম সিরিজ, নির্ণয়সাগর গ্রন্থমালা (বোম্বাই), আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা (পুনা) প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থমালায় বহু দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রয়োজনের তুলনায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পুস্তক প্রকাশ-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ দেখিয়া ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের সঙ্গে উহা প্রকাশের জন্য "ত্রিবেন্দ্রম ম্যানস্ক্রিপট্ সিরিজ" নামীয় গ্রন্থমালারও প্রবর্তন করেন। ত্রিবেন্দ্রমের সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে মহারাজা গণপতিকেই উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এবং ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালা তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯০৮ হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পুঁথিশালার অধ্যক্ষ (কিউরেটর) রূপে গণপতি স্বয়ং ১৪০০ শত খানি দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত প্রথম ৮৭ খানি পুস্তকের ৬৮ খানি গণপতি একক চেষ্টায় টীকা, টিপ্পনী ও বিস্তৃত ভূমিকাসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকগুলি বেদ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্ক, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, স্থাপত্য, তন্ত্র, কল্প, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সম্পাদকরূপে গণপতি এই পুস্তকগুলির সহিত যে সব ভূমিকা, টীকা প্রভৃতি রচনা করেন সেগুলি একত্র করিলে বৃহৎ আকারের

৮০০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তকের রূপ লইতে পারিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণে প্রাচ্যবিদ্যা-পারঙ্গম মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত ত্রিবেন্দ্রম্‌ সংস্কৃত গ্রন্থমালার শুদ্ধপাঠ, সুষ্ঠু সম্পাদন ও জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। গণপতির একক চেষ্টায় সংস্কৃতের ৪৩ জন লেখকের রচনা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই লেখকদের নাম ও পরিচয় তাঁহারই চেষ্টায় প্রচারিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ ইতিহাস রচনায় গণপতি শাস্ত্রী পরিবেশিত তথ্য ও তাঁহার মতামতগুলি বর্তমানে অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

সংস্কৃত লৌকিক-সাহিত্যের (ক্লাসিক্যাল) কালিদাস পূর্ববর্তী কবি ভাস ও তাঁহার রচনাবলী বর্তমানে সুপরিচিত। ভাসের রচনাবলী আবিষ্কার ও তাহার প্রচার গণপতির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরা ভাসের নামের সহিত অপরিচিত ছিলেন না। সুপ্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিক ভামহ তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে ভাসের রচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহা সংস্কৃতজ্ঞদের নিকট সুবিদিত। এতদ্‌ব্যতীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে (খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দী) বাণভট্টের (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) হর্ষচরিত কাব্যে, বাক্‌পতির (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী) গৌড়বহ কাব্যে এবং রাজশেখরের (৯ম শতাব্দী) রচনাতেও একজন সুকবি হিসাবে ভাসের প্রশংসা ও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভাসের রচনা আমাদের দেশে সুপ্রচারিত ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্তী সহস্র বৎসরের মধ্যে ভাসের রচনার কোন নাম অথবা নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত কবি ভাস তাঁহার নামের মধ্যেই জীবিত ছিলেন মাত্র, তাঁহার কোন রচনার কোন সন্ধানও এই কালের মধ্যে পাওয়া যায় নাই।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেন্দ্রমের সরকারী পুঁথি সংগ্রহালয়ের অধ্যক্ষরূপে পুঁথি সংগ্রহের কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময় গণপতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে পদ্মনাভপুরম্ নামক স্থানের নিকট অবস্থিত মানালিক্কর মঠ হইতে তালপত্রে লিখিত ১০ খানি নাটক উদ্ধার করেন। এই নাটকগুলি একত্রে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সংস্কৃত ও শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত এই নাটকগুলি মালয়ালী (মলয়ালম) অক্ষরে লিখিত ছিল। গণপতি শাস্ত্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে এইগুলি স্থানীয় লোকেরা প্রাচীনকালে যাত্রার 'পালা' হিসাবে ব্যবহার করিত। দশখানি পুঁথি উদ্ধারের পর গণপতি এইস্থান হইতে আরও তিনখানি পুঁথি পান। এই তিনখানি পুঁথির মধ্যে দুইটির প্রতিলিপি ত্রিবাঙ্কুর রাজপ্রাসাদস্থ পুঁথি সংগ্রহের মধ্যেও পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির কোনটিরই প্রস্তাবনা অথবা পুষ্পিকায় ভাসের নামের উল্লেখ ছিল না। অলঙ্কার শাস্ত্র এবং লৌকিক-সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভাষা সাহিত্যে প্রগাঢ় দক্ষতা হেতু গণপতি এইগুলিকে ভাসের লুপ্ত রচনারূপে চিহ্নিত করেন। এই নাটকগুলিতে সন্নিবিষ্ট শৌরসেনী প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেই তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে এইগুলি কালিদাস পূর্ববর্তী যুগে লিখিত হইয়াছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গণপতি ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালায় উপরিউক্ত তেরখানি নাটক ভাসের নামে চিহ্নিত করিয়া প্রকাশ করেন।* ইহার সহিত তিনি সংস্কৃত সাহিত্য মন্থনপূর্বক বহু যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করিয়া ভাস সম্বন্ধীয় তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। এই নাটকগুলির সহিত গণপতির নিজস্ব টীকা, টিপ্পনীও সংযোজিত হয়। গণপতি শাস্ত্রী এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে কালিদাস শুধু বাল্মীকি ও ব্যাসের নিকট ঋণী নহেন, তিনি ভাসের দ্বারাও

*অভিষেক নাটকম্, অবিমারকম্, চারুদত্তম্, পঞ্চরাত্রম্, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্, প্রতিমানাটকম্, স্বপ্নবাসবদত্তম্, দূত ঘটোৎকচম্, কর্ণভারম্, উরুভঙ্গম, মধ্যম ব্যয়োগঃ, বালচরিতম্, দূত বাক্যম্ (১৯১২-১৯১৫)

প্রচুরভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। 'শূদ্রক' রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকটির উপাদানও ভাসের চারুদত্ত নাটক হইতে গৃহীত হইয়াছে—গণপতি এই মত প্রকাশ করেন।

ভাসের রচনাবলীর আবিষ্কার সংবাদে ভারতে ও ভারতের বাহিরে সংস্কৃতজ্ঞ সুধিবর্গের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভাসের রচনাবলী গণপতি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই রচনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ পান। ভাসের রচনাবলী প্রকাশের পর অতি সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ভাস সম্বন্ধীয় গবেষণা চলিতে থাকে। ভাস প্রসঙ্গে গবেষণাকারী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে য়াকোবি, য়ুয়োলি, উইন্‌ট্যরনিৎজ, ষ্টেনকোনো, ল্যাকোটে, বার্নেট, ফ্রেডরীখ্ টমাস্ ও আর্থার বেরিডেল কীথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত পিসারোটি, সুখ্ঠণ্‌কর, রামাবতার পাঁড়ে, পরশুরাম বামন কানে, রঙ্গাচারী ও অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-শাস্ত্রীর নামও ভাস-বিতর্ক প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল আলোচনান্তে অধুনা এই মতটিই সর্বজন-গ্রাহ্য হইয়াছে যে গণপতি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত ভাসের রচনাবলী প্রকৃতই ভাস রচিত এবং ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি। ভাস-আলোচনায় প্রসিদ্ধ ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর্থার বেরিডেল কীথ্ গণপতির মতামতগুলি সর্বাধিকভাবে সমর্থন করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এল. ডি. বার্নেট এবং দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে পিসারোটি ও রামাবতার পাঁড়ে ভাসকে কালিদাসের পরবর্তী বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে ভাস সম্ভবতঃ ৭ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। গণপতি ভাসকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলিয়া অনুমান করেন, গণপতির এই মতটি অবশ্য কেহই গ্রহণ করেন নাই; কীথ্ ও উইন্‌ট্যরনিৎজ উভয়েই ভাসকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী অথবা চতুর্থ শতাব্দীর কালিদাস পূর্বযুগের কবি বলিয়া

সিদ্ধান্ত করেন। সাধারণভাবে ভাসের কাল হিসাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতানুযায়ী কালই গৃহীত হইয়াছে। ভাস বিতর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণপতি প্রতিপক্ষের মতকে বিধ্বস্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন একথা বলাই বাহুল্য।

ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালায় গণপতি সম্পাদিত অসংখ্য পুস্তকাবলির মধ্যে তাঁহার আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প (৭৬নং, ১৯২০—১৯২৫) ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (৩ খণ্ড, ১৯২১—১৯২৫)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি দ্রাবিড় পণ্ডিত শ্যামাশাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সহিত গণপতির নিজস্ব একটি উপাদেয় টীকা (শ্রীমূলম্) সন্নিবিষ্ট ছিল। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প পুস্তকে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল নৃপতি ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বিবরণ আপাত-দুর্বোধ্যরূপে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপযোগী অমূল্য উপাদানে ইহা সমৃদ্ধ। গণপতি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকটি অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে যশস্বী ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল (১৮৮১-১৯৩৭) একটি অতি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি করেন (An Imperial History of India in a Sanskrit Text, 1934)।

ত্রিবেন্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে গণপতি শুধু সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ন্যায় রাজনীতিসংক্রান্ত পুস্তক সম্পাদন ও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রযুক্তি-বিদ্যাসংক্রান্ত কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রকাশিত-সংস্কৃত-সাহিত্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে গণপতি সম্পাদিত "সমরাঙ্গন সূত্রধার" (গায়কোয়াড় প্রাচ্যবিদ্যা সিরিজ, ১৯২৪), পুস্তকটির নাম উল্লেখযোগ্য। ভোজরাজের নামে প্রণীত এই পুস্তকটি

হইতে শিল্পচর্চায় এবং গৃহ-ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সামরিক দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়েরা কতদূর ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ভোজ রাজের নামে বইটি প্রচলিত হইলেও মনে হয় ইহা ভোজের নামে সঙ্কলিত হইয়াছে মাত্র। ইহাতে লিপিবদ্ধ তথ্যগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাচীন ভারতবাসিগণ গার্হস্থ্য ও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। গণপতি সম্পাদিত বাস্তুবিদ্যা ও শিল্পসংক্রান্ত আরও কয়েকটি পুস্তকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—বাস্তুবিদ্যা (১৯১৩), ময়মতম্ (১৯১৯), শিল্পরত্ন (শ্রীকুমার রচিত ১৯২২) প্রভৃতি।

ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত পুঁথিসংগ্রহশালার অধ্যক্ষ ও ত্রিবেন্দ্রম্ গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে গণপতির পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতপ্রিয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংস্কৃত সম্মেলনে গণপতিকে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই বৎসরই ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রধানতঃ প্রাচীন পন্থায় সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করিলেও গণপতি নিজের চেষ্টায় ইংরাজী ভাষাও উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালার বহু পুস্তকে তাঁহার লিখিত ইংরাজী ভূমিকা সংযোজিত আছে। শুধু বিদেশী ভাষাতেই তিনি দক্ষতা লাভ করেন নাই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ন্যায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা পদ্ধতিও তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় ভাসের নাটকাবলী আবিষ্কার ও প্রকাশের জন্য গণপতিকে পি-এইচ. ডি. উপাধি দান করেন। লণ্ডনস্থ গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্য শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ওরিয়েণ্টেল

সোসাইটি, গ্রেটব্রিটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফ্রান্সের সোসাইতে এশিয়াটিকের সদস্যবৃন্দ পারী শহরে একটি মিলিত অধিবেশনে গণপতি শাস্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা সম্বলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে ইউরোপ আমেরিকার এই সব প্রাচ্যবিদ্যা সেবকেরা এই আশা পোষণ করেন যে ডঃ গণপতি শাস্ত্রী দীর্ঘজীবী হইবেন এবং তাঁহার অতি উপাদেয় গবেষণা ধারা যাহা ভারতবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা অব্যাহত থাকিবে। আর্থার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল, ফ্রেডারিক্ এডেন পার্জিটার, লিয়োনেল্ ডেভিড্ বার্নেট, জর্জ গ্রীয়ারসন্, ফ্রেডারিখ্ উইলিয়ম্ টমাস, আর্থার বেরিডেল কীথ, এডোয়ার্ড জেমস র‍্যাপসন্, এমিল চার্লস সেনার, সিলভ্যাঁ লেভি, লুই ফিনো, জুল ব্লখ্, মরিস্ ব্লুমফিল্ড, নর্মান ব্রাউন, চার্লস রকওয়েল লানম্যান প্রভৃতি ইংরাজ, ফরাসি ও মার্কিন প্রাচ্য-বিদ্যা বিশারদেরা এই প্রশস্তি পত্রে স্বাক্ষর দান করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট হইতে ভারতীয় পণ্ডিতদের এইরূপ সংবর্ধনা লাভের দৃষ্টান্ত বড় বেশি পাওয়া যায় না।

দীর্ঘ সতের বৎসর কাল ত্রিবাঙ্কুর পুঁথি সংগ্রহালয়ের অধ্যক্ষতা করার পর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গণপতি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার অল্প কিছুকাল পরে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল স্বীয় পল্লীভবনে তিনি পরলোক গমন করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও সহকর্মিগণ ত্রিবাঙ্কুর সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহালয় ও ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ প্রকাশনার কাজ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ ত্রিবেন্দ্রম্ প্রাচ্য বিদ্যা সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহালয় ভবনে কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় মহামহোপাধ্যায় গণপতির একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আনুষ্ঠানিকভাবে এই চিত্রের আবরণ উন্মোচন

করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গণপতি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করেন এবং বলেন যে গণপতির জীবনব্যাপী সাধনা অতীত ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস তথা সাহিত্যের যথাযথ ইতিহাস উদ্ঘাটনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। শঙ্করাচার্য যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশে তাঁহার জন্ম সার্থক হইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পর দেশীয় রাজ্যরূপে ত্রিবাঙ্কুরের বিলুপ্তি ঘটে এবং ইহা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন নামে একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার কিছুকাল পর রাজ্যসমূহের পুনর্বিন্যাসের ফলে ত্রিবাঙ্কুরের মালয়ালমভাষী অঞ্চল কেরল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম্ এই কেরল রাজ্যের রাজধানী হয়। কেরল রাজ্য পুনর্গঠিত হইবার পর বর্তমানে ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ—কেরল বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সিরিজ ও ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ এই যুক্ত নামে প্রকাশিত হইতেছে। গণপতি শাস্ত্রীর অধ্যক্ষতার কাল হইতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সিরিজে ২১৩ খানি দুর্লভ সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থমালায় মহামহোপাধ্যায় গণপতিশাস্ত্রী সম্পাদিত এই পুস্তক-গুলির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিকা (১৯০৯), দুর্ঘট বৃত্তি (১৯০৯), পরমার্থসার (১৯১১), কামন্দকীয় নীতিসার (১৯১২), বৈখানস ধর্ম প্রশ্ন (১৯১৩), জানকী পরিণয় (১৯১৩), বররুচি সংগ্রহ পরিভাষা-বৃত্তি (১৯১৫), তন্ত্রশুদ্ধপ্রকরণ (১৯১৫), আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (১৯১৫), নাম লিঙ্গানুশাসন (১৯১৪-১৭), শব্দনির্ণয় (১৯১৭), সর্বমতসংগ্রহ (১৯১৮), তন্ত্রসমুচ্চয় (১৯১৯), তত্ত্বপ্রকাশ (১৯২০), বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র (১৯২০), মধুসূদন সরস্বতীকৃত ঈশ্বর প্রতিপত্তি প্রকাশ (১৯২১), যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (১৯২২), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (১৯২৩), সঙ্গীত সময় সার (১৯২৫), ও বিষ্ণুসংহিতা (১৯২৫)।

সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট

[শ্রীঅমিতাভ সেনগুপ্ত ও শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত]